পুরাতত্ত্বের আলোতে

প্রস্তর যুগ থেকে জন্ম

ভারতের সভ্যতা

(মেহরগড়-সরস্বতী-হরপ্পা)

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার

পুরাতত্ত্বের আলোতে

প্রস্তর যুগ থেকে জন্ম

ভারতের সভ্যতা

(মেহরগড়-সরস্বতী-হরপ্পা)

ড. শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার

ঃ প্রকাশক ঃ

শ্রীগুরু প্রকাশনী

হিজলপুকুর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

In the light of Archaeology
The Birth of Indian
Civilization (Mehrgrah–Sarasvati–Harappa)

প্রকাশক ঃ

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার

ফোন ঃ ৯৮৩০২৭৪০২১

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ, ২০১২

বিনিময়ে ঃ ২৪.০০ টাকা মাত্র

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেতু প্রকাশনী
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্
কলকাতা—৭০০০৭৩

কুণ্ডু বুক স্টল
হাবড়া ষ্টেশন
১নং প্লাটফর্ম

মুদ্রক ঃ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

ভারতবর্ষকে জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে বর্তমান গ্রন্থের উৎপত্তি। ছাত্র জীবনে এই দেশকে জানার তেমন কোন আগ্রহই ছিল না। তখন সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রতি ছিল খুব আকর্ষণ ক্রমাগত ঐসব দেশের পক্ষে গুণগান ও ব্যাপক প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। পরবর্তী অনেক ঘটনা বিশেষত, একদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি এবং অপর দিকে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিনদের ও জন মার্শালের গ্রন্থ এবং ঋগ্বেদ পড়ে স্বদেশকে জানার আগ্রহ জন্মে। মনে মনে ঠিক করি যে ভারতবর্ষকে জানতে হবে প্রস্তর যুগ থেকে।

প্রত্নবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান অনুসারে জানা গেল যে ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রস্তর যুগে মানুষ ছিল। খাদ্যান্বেষণের কারণে 'সীমিত ভ্রাম্যমান' জীবন ত্যাগ করে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ কোথায় এবং কেন একই জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করল এবং পশুপালন, কৃষি, ঘরবাড়ি, নগরায়ণের সূচনা করল সে খবর জানা যাবে এই গ্রন্থে মেহেরগড় সভ্যতার বিবরণ থেকে। যারা প্রথমে কাঁচা মাছ, মাংস, ফলমূল খেত তারা চার হাজার বছরের মধ্যে প্রমাণ রেখে গেল তাদের উত্তরণ ঘটেছে এক পরিশীলিত সমাজের সভ্য হিসাবে। মেহেরগড় থেকে আট কি.মি. দূরে নোশারোতে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির নারীমূর্ত্তি কেশবিন্যাস করা যার সিঁথি।
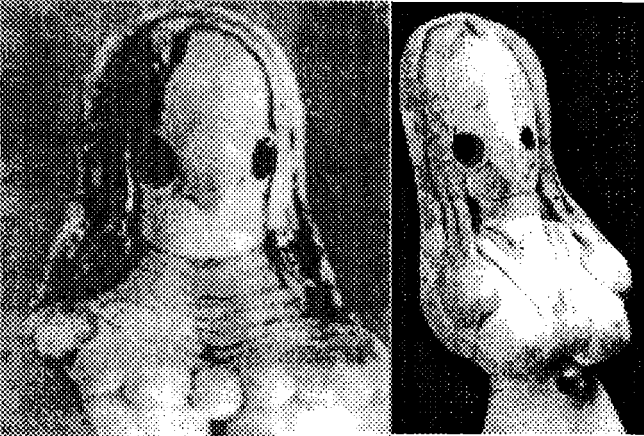
নারী মূর্ত্তি (নোশারো)—সিঁথিতে সিন্দুরের চিহ্ন হতে পারে

(অশোক দাশগুপ্ত, *হিস্ট্রি নাউ*, সংখ্যা ১/১, ২০০৫ পৃ. ৫)

পূজার বেদী বহু ভারতবাসীর কাছেই পবিত্র। বেদীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সোন নদীর উপকূলে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের স্তর ব্যাগহর থেকে যা এখানে উল্লেখ করেছি।

সরস্বতী নদীর উপকূলে সরস্বতী সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল ছয় হাজার বছর প্রাচীন সময়কাল থেকে। প্রত্নবিজ্ঞানী ও ভূবিজ্ঞানীদের দ্বারা মৃত সরস্বতী নদীর উৎস, গতিপথ ও সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার ফলে এই নদী সম্বন্ধে বর্তমানে আর কোন বিভ্রান্তিরই অবকাশ নেই। ঋগ্বেদে সরস্বতী নদী সম্বন্ধে যা আছে তাকেই অনেক বিজ্ঞানী পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সরস্বতী নদীর জন্য সরস্বতী সভ্যতার উৎপত্তি আবার এই নদীর বিনাশের ফলেই সরস্বতী সভ্যতার মৃত্যু হয়েছে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে। সভ্যতার উত্থান ও পতনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ পুরাতত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একজন সামান্য গবেষকের কাছে যে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হয়েছে তা হল সাত হাজার বছর ধরে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক ধারাবাহিকতা চলছে। ভাবতে অবাক লাগে আধুনিক ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্ভারের মধ্যে আজও আছে সেই সব উপাদান যার সৃষ্টি সাত হাজার বছর প্রাচীন সময়কাল থেকে। ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টাদের বর্তমান ভারতবাসীর পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়। এই প্রাচীন সভ্যতা বর্তমানে সঙ্কটের আবর্তে। ভারতীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উপায়ের কথাও বলার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের শেষে।

এই কাজে মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম্ এর শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থাগারিক ডঃ পাত্র মহাশয়ের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয়া শ্রাবণী ভট্টাচার্য মহাশয়াকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শের জন্য। আর ধন্যবাদ জানাই কম্পুউটার গ্রাফিক্সের কর্ণধার শ্রী বিজন চৌধুরীকে।

নানাভাবে সহযোগিতা পাবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীগোপলচন্দ্র সরকার, সর্বশ্রী বোধিসত্ত্ব সরকার, জ্যোর্তিময় সরকার, শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার, শ্রীমতী পুতুল সোম, সুব্রত চ্যাটার্জী, নিত্যরঞ্জন দাস, শ্রীমতী ঝর্ণা সরকার ও সুনীল সরকার মহাশয়কে।

ঃ উৎসর্গ ঃ

প্রাচীন ভারতের মেহেরগড় সভ্যতার আবিষ্কারক
জে. এফ. জারিজ, বি. আলচিন
ও
আর আলচিনকে

বিষয়সূচী

পূর্বাভাস

সুনামির ভয়ঙ্কর ধ্বংসের পূর্বাভাস পেয়ে অস্থিরতায় দাপাদাপি ও চীৎকার শুরু করেছিল সমুদ্র উপকূলের কুকুরেরা। আমরা ভারতবাসীরা কি ৯+ হাজার বছরের সুপ্রাচীন এই দেশের সভ্যতা-ধর্ম-সংস্কৃতি ধ্বংসের কোনই পূর্বাভাস পাচ্ছি না? কিছু মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন। অল্প কিছু লোক লেখায় ও কথাবার্তায় বলছেন যে তাঁরা ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পতনের পূর্বাভাস পাচ্ছেন। ধ্বংস হবে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের মত প্রাকৃতিক কারণে নয়; ধ্বংস হবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দেশে একই অভিন্ন আইন সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে না থাকার কারণে। জাতিগত জনবিন্যাসের প্রকৃতির অতি দ্রুত পরিবর্তনের ফলেই ধ্বংস অনিবার্য। বিগত ১৩০০ বছরে ভারতে যা সম্ভব হয়নি আগামী ২/৩ শত বছরের মধ্যে তা ঘটবে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিতে ভারতবাসীরা ভুল করেন। দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারত ও চীন। চীনের শাসকরা সুনামির পূর্বাভাস পেয়ে ১৯৮২ সালে অভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতবাসীরা ঘুমিয়ে আছে।

ভারতের নারীপুরুষেরাই ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। হাজার হাজার বছর ধরে তাঁদের দ্বারাই এদেশের ধর্ম ও সভ্যতার সৃষ্টি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকাশ। যুগের প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে এসেছেন অনেক মহাপুরুষ। খৃষ্ট বা মহম্মদের মত একজনের অপরিবর্তনীয় আদেশ, নির্দেশ, প্রচার, যুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা ভারতের ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেনি। গণতন্ত্রে যেমন হয় তেমনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতবাসীর দ্বারাই সৃষ্ট ভারতের ধর্ম। যেমন ঋগ্বেদের ঋষি ৭জন নারী ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র রচনার অধিকার একমাত্র ভারতেই নারী-পুরুষ উভয়েরই ছিল।

প্রস্তর যুগের শেষ থেকে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম ভারতের ধর্ম-সভ্যতা। যেমন মানুষের বাড়ি-ঘরের আকাঙ্ক্ষা থাকে তেমনি ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা থেকেই ভারতে ধর্মের সৃষ্টি।

প্রসঙ্গঃ প্রস্তর যুগে ভারত

প্রস্তর যুগের ভারতে বাঘ, হরিণ, হাতি, গণ্ডার, বুনোশুয়োর, জলহস্তি এবং গাছের জীবাশ্ম আবিষ্কার হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার সিলেও আছে বড় বড় সিং

ও কুঁজের ষাঁড়, হাতি, বাঘ, হরিণ প্রভৃতি। পশুর রাজত্ব ছিল বলেই একাধিক হরপ্পা সিলে আছে দেবতা 'পশুপতি'। পশুর ও গাছের জীবাশ্ম থেকে প্রমাণিত যে প্রস্তর যুগের ভারতে গভীর জঙ্গল ছিল এবং জঙ্গলের রাজত্বের রাজারাণীরা ছিল অতিকায় হিংস্র বন্য প্রাণীরা।

বিজ্ঞানী কেনেডি, সোনাকিয়া, সিং, সংখ্যায়ন, রাজেন্দ্রন যথাক্রমে ১৯৮০, ৮২, ৮৫, ৯৭ এবং ২০০১ সালে দাড়া-ই-কুর (আফগানিস্তান), হাতনোরা (মধ্যপ্রদেশ), নাদাহ (চন্ডিগড়), হাতনোরা এবং ওডাই (তামিলনাড়ু) থেকে ৩০ হাজার, ৫ লক্ষ, ১৮ লক্ষ বছরের কম প্রাচীন, ২০-৫০ লক্ষ, ১৬৬০০০ বছরের প্রাচীন ভারতে মানুষের (হাড়ের, দাঁতের) জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন (D. Chakraborti, *Indian Archaeology,* OUP : 10–15)। এইসব জীবাশ্ম ভারতে যে পাওয়া গেছে পঃ বঙ্গের ছাত্ররা তা কিন্তু জানে না। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে (*ইতিহাস প্রাচীন* ঃ ১৯৯৪–২০০৮) 'আদিম যুগের মানব'—এবিষয়ে চীনদেশের জন্য ৪৬টি শব্দ ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে একটি শব্দও ব্যয় করা হয়নি। নিজের দেশের সম্পর্কে ছাত্রদের কিছুই না জানানো কেন? ভারতের কথা ভুলে বিদেশ সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি প্রথমেই দরকার কেন?

জীবাশ্মের সংখ্যা ভারতে কম* হলেও প্রস্তরযুগের ভারতবাসীর তৈরি সংগৃহীত পাথরের হাতিয়ারের সংখ্যা লক্ষাধিকও হতে পারে। কর্ণাটকের আছিমপুর থেকেই ১৫০০০ পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতিয়ার তৈরির ফ্যাক্টরি ছিল নানা স্থানে। শিল্পাঞ্চলও ছিল। প্রস্তরযুগের ভারতের মানচিত্রে দেখা যায় যে একমাত্র কেরালা ছাড়া ভারতের সমস্ত বৈচিত্র্যময় অঞ্চল থেকে প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কেরালা ছাড়া ভারতের সব অঞ্চলে, বিশেষত ভারতের নদী উপত্যকা অঞ্চলে প্রস্তর যুগের ভারতবাসীরা ছিলেন।

পাথরের অস্ত্র তৈরী ও প্রয়োগ করে সেযুগে ভারতের মানুষ পশুর রাজত্ব ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এই অস্ত্রগুলি হল হাতকুঠার, কাটারি, ঘষতে বা পশুর ছাল ছাড়াতে তৈরী পাথরের অস্ত্র, পশুকে বা অন্যকিছুকে বিদ্ধ করতে তীক্ষ্ণাগ্র পাথর, ছুরি, দুদিকে ধারালো ছুরি, বাটালি প্রভৃতি। পাহাড়ের পাথর (rock) বা নুড়ি (pebble) দিয়ে হাতিয়ার বানানো হতো। নরম পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরী তারা করত না। প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত অনেক অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে।

---

* আমাদের প্রচেষ্টার অভাবের জন্য কম জীবাশ্ম সংগ্রহ হয়েছে এই মত উদাহরণ তুলে ধরে ব্যক্ত করেছেন বিজ্ঞানী কেনেডি (Chakraborti : 11)।

প্রস্তর যুগের ভারতের মানচিত্র

প্রত্ন প্রস্তর যুগের অনুন্নত অস্ত্র যেমন—হাতকুঠার
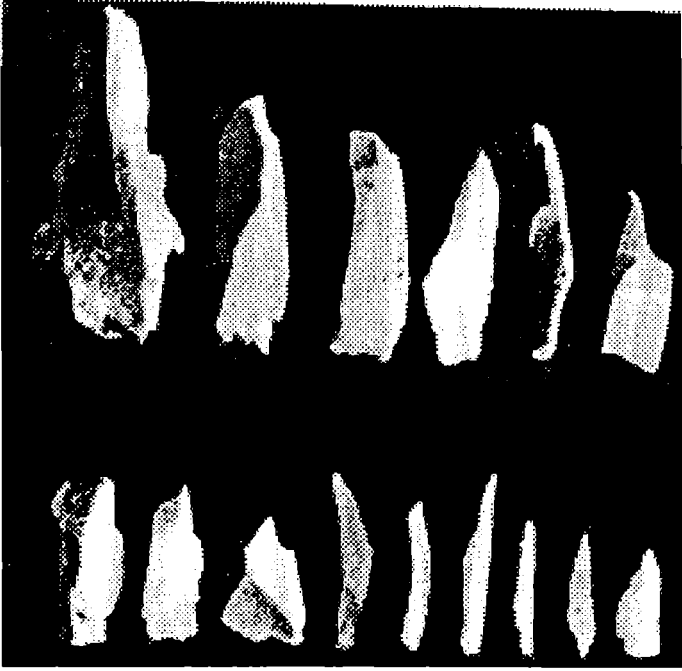
নব্যপ্রস্তর যুগের উন্নত অস্ত্রের নমুনা—ছুরি ও বাটালি
—ডি. পি. অগরয়ালের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নব্যপ্রস্তর যুগের হাড়ের অস্ত্র
(পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি তরবারি)

ভারতের মানুষ পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখল। দূর থেকে যখন পশুর উপর পাথরের অস্ত্র প্রয়োগ করে বধ করতে শুরু করল তখনই ভারতে পশুদের জঙ্গলের রাজত্বের অবসানের যুগ ও মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জয়যাত্রার যুগ আরম্ভ হল। এই প্রস্তর যুগ ধীর্ঘ। অতিক্রম করতে লেগেছে ৭ লক্ষ বছরের বেশী সময়। পাথরের অস্ত্রের গুণগত মান উন্নয়নে ও উন্নত কৌশল আবিষ্কারে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছিল। ভারতের শিবালিক অঞ্চল থেকে তিনটি হাতকুঠার আবিষ্কার হয়েছে যার বয়স ৭ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ বছরের মধ্যে (UNESCO, *History,* v.2:80)। চেন্নাইয়ের পশ্চিমে কোরতাল্লায়ার নদী উপত্যকায় ৩৫,০০০ পাথরের তৈরি নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে যার বয়স ১৫ লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে যদিও বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া দরকার (সংবাদপত্র, ২৫.৩.২০১১)। নব্য প্রস্তর যুগে (১,৩০,০০০—১০,০০০ বছর) ভারতবাসীরা উন্নত পাথরের অস্ত্র তৈরিতে যেমন পারদর্শী হয় তেমনি দূর থেকে অস্ত্র প্রয়োগেও দক্ষ হয়ে ওঠে। 'দুর্জ্জয় হিংস্র জীবসমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া' (রাখাল দাস : ৮) ভারত ভূমিকে বাসোপযোগী করেন নব্য প্রস্তর যুগের শেষে ভারতবাসী। ভারতবাসীর সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতির শুরু হল। তা চলতে থাকল ভিতরের ও বাইরের বিরুদ্ধ শক্তির অবিরাম আক্রমণ সত্ত্বেও। যাঁরা ভারতে জঙ্গলের জানোয়ারের রাজত্ব ধ্বংস করে মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরাই আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ, তাঁরাই ভারতে মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। অহিংস পদ্ধতিতে মানবসভ্যতা যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে প্রমাণ নেই।

মানুষের দ্বারা উন্নতমানের পাথরের অস্ত্র তৈরি ও তার প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগে। এরই ফলে শিকারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মরক্ষার সুযোগও গেল বেড়ে। সম্ভবত পশুর আক্রমণের ভয়ে স্থানান্তরে পালানো যত কমতে থাকল ততই এক জায়গায় থাকার সম্ভাবনা বাড়ল অবশ্য যদি সেখানে খাদ্য মিলত। বন্য প্রাণীকে পোষমানান এবং খাদ্যশস্যের বীজ বা উদ্ভিদ লাগানো—এ দুইয়ের মধ্যে বীজ বা উদ্ভিদ লাগানোর তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। বীজ বা উদ্ভিদ লাগানোর জন্য উর্বর ক্ষেত্র যেমন ছিল আকর্ষণীয় তেমনি ফসল রক্ষা করতে ও ফসল পেতে মানুষকে সেখানে থাকতেও হয়। প্রয়োজনের তাগিদেই স্থায়ী বসবাস শুরু যা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে গ্রাম ও নগর।

ভারতে কৃষির সূচনা

প্রায় ১০,০০০ থেকে ৭০০০ বছরের মধ্যে ভারতে মানুষের বসতি শুরুর যুগ। ৯০০০ বছর পূর্বে রাজস্থানের সম্বর, লুনকারানসর ও দিদোয়ানাতে ১৪সি

কার্বন পরীক্ষার তারিখ অনুসারে 'এক রকম আদিম প্রকার কৃষির' প্রমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে পাওয়া গিয়েছে (..."at c. 7000 B.C. a *Cerealis* type of pollen occurs... indicative of forest clearance and the beginning of 'some sort of primitive agriculture.'" –D.P. Agarwal, *Archaeology of India* : 92)। ১৯৭৭ সালে সি.এ.রিড ঘোষণা করেছিলেন যে এখন থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে ভারতে কৃষি যে ছিল তার প্রমাণ নেই। তার ধারণা এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে (Jarrige, *Origin of Harappan Civilization*...p.93)।

ধানের প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম ভারতেই পাওয়া গিয়েছে। এলাহাবাদ (উত্তর প্রদেশ) থেকে ৮৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে কোলদিহাওয়া ও মহাগড়া স্থানে ৭০০০ বছর পূর্বে তৈরি মাটির বাসনের উপর ধানের খোসার ছাপ ('husk impression') আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং ধানচাষ ৭০০০ বছরের পূর্বে থেকেই উত্তর প্রদেশে হয়েছে। বি.বি. লালের মতে ধানচাষ ৮০০০ বছর থেকে শুরু হতে পারে (...'sites of Koldihawa and Mahagara jointly indicate that the cultivation of rice in this part may have ensued, again, in the sixth millennium B.C. If this evidence is confirmed by excavations at other similar sites, it may well turn out that India was the earliest rice-producing country in the world (B.B. Lal, 'Foreword', in R. P. Sing, *Agriculture in Protohistoric India*; also Agarwal : 92)।

ভারতের মেহেরগড় সভ্যতা
(৮০০০–৪৫০০ বছর প্রাচীন)

ভূমিকা

প্রস্তর যুগের শেষে ক্রমে ক্রমে উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির জন্ম দিতে দিতে ভারতবাসীর যাত্রা শুরু পৃথিবীর পথে। ৫৫০০ বছর প্রাচীন ভারতবাসীর সৃষ্টি জগৎ বিখ্যাত হরপ্পা সভ্যতা। তারও ৩০০০ বছর পূর্বে ভারতবাসীরই প্রথম সৃষ্টি মেহেরগড় সভ্যতা। তিন সহস্রাব্দ সময়কালব্যাপী উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চলে এই সভ্যতা চলতে থাকায় মেহেরগড় সভ্যতায় স্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে এক দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নিজস্ব

আঞ্চলিক চরিত্র (...'a long cultural tradition and its own regional characteristics'–*J.F. Jarrige* : 94)। ভারতের এই আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রষ্টারা ছিলেন ভারতের প্রস্তর যুগ থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ। বোলন, সিন্ধু, সরস্বতী নদীউপত্যকার বিস্তীর্ণ ভূমিতে নব্যপ্রস্তরযুগের শেষ থেকে ভারতের মানুষ যে উন্নত ও মূল্যবান সংস্কৃতির ধারার জন্ম দিয়েছিল সেই ধারাতেই সৃষ্টি বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি শাশ্বত গ্রন্থের। এই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আছে। ভারতের এই সৃজনশীল প্রতিভা ও শক্তিকে ধ্বংস করতে শুরু করে বিদেশী আক্রমণকারিরা। ২৬০০ বছর পূর্বে প্রথম পারসিক (Achaemenian) আক্রমণ। বিদেশী নাম-ধাম ভুলে তারা ভারতবাসী হল। তারপর গ্রীক, শক, কুশান, ইরাণীদের আক্রমণ। ৬৩৬-৩৭ সালে খালিফা উমরের সময়ে মুম্বাই অঞ্চলে প্রথম মুসলিম আক্রমণ ও লুঠ। এদের আক্রমণের ধারাবাহিকতাই বৈশিষ্ট্য। অনেক আক্রমণের পর ৭১১ সালে সিন্ধু দখল, তারপর অনেক আক্রমণের পর ১১৯২ সালে সিহাবুদ্দীন ঘুরীর দিল্লী দখল। মুসলমানরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল কেন? তার পরের প্রায় হাজার বছরের ভারতবাসীর পরাধীনতা ও ধর্মান্তরিত হওয়ার যুগ। নায্য কী ধর্মান্তরকরণ? ধর্মান্তরিত ভারতবাসী মুসলমান হল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ৮২% পাকিস্তান দাবীর পক্ষে ১৯৪৬ সালে বাংলায় নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল ('In that election, seen as a referendum on Pakistan, Bengali Muslims voted 82 percent in favour of Muslim League'– ...*Encyclopedia of Asian History,* v.1,p.135) ।

মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি বহু দেশের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম যেমন প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন ভারতের অনেক জায়গায় (যেমন আফগানিস্তান, পাকিস্তান) তেমনিই ঘটেছে। ভিতরে ও বাইরে বিরুদ্ধ শক্তি খুব প্রবল। রাজনীতিতে ক্ষমতার লোভ কোন বাধা মানে না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মৃত্যুর সম্ভাবনা এই প্রাচীন জাতির। ভারতবাসীকে ভবিষ্যত চিন্তা করতে হবে। আমাদের আত্মপরিচয় ধ্বংস করার প্রক্রিয়া প্রবল। আচার্য প্রণবানন্দজির অমূল্য বাণী ঃ 'মহামৃত্যু কি? আত্মবিস্মৃতি'। মহামৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় জাতির আত্মপরিচয়ের প্রকৃত ছবি চোখের সামনে তুলে ধরা এবং পতনের কারণগুলি দূর করা। ভারতের মেহেরগড় সভ্যতা হল ভারতবাসীর প্রাচীনতম আত্মপরিচয়েরই প্রথম ঠিকানা।

বোলন-সিন্ধু-সরস্বতী নদীর অববাহিকায় ভারতবাসীর সভ্যতার জন্ম
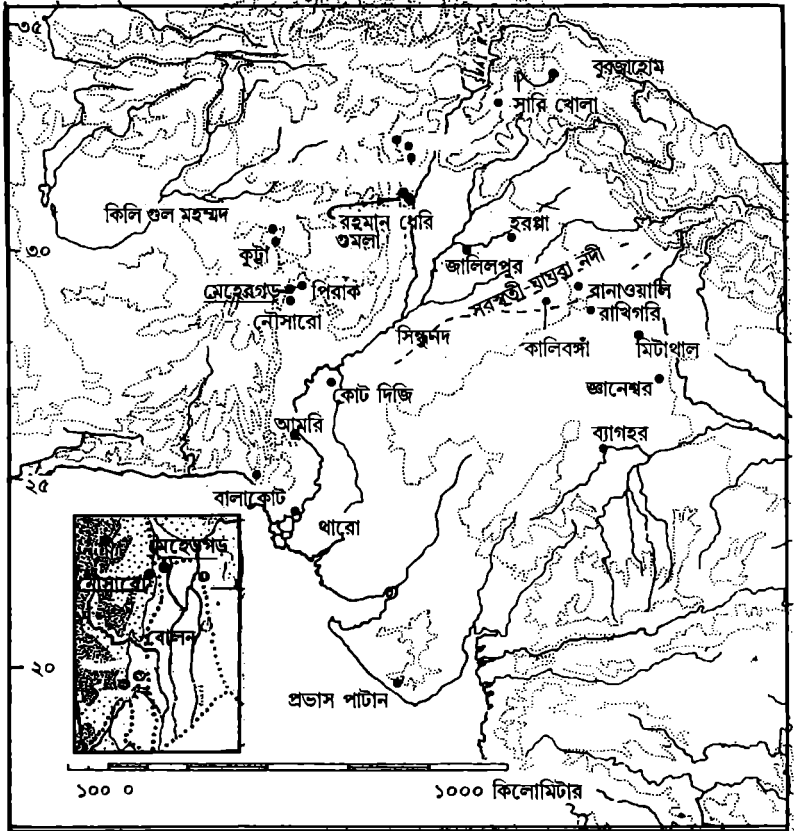
প্রত্নবিজ্ঞানী জারিজ ও আলচিনের প্রতি কৃতজ্ঞ

মেহেরগড় সভ্যতার পটভূমি

প্রাচীন ভারতের মেহেরগড় সভ্যতা জগৎ বিখ্যাত। পৃথিবীরই প্রাচীনতম সভ্যতা। মেহেরগড় সভ্যতা সৃষ্টির সময়কাল ৯০০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন হতে পারে। এই সভ্যতার তাৎপর্যও অসাধারণ। এই সভ্যতার উৎপত্তি থেকে জানা যায় কিভাবে নব্য প্রস্তর যুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চলের

মানুষ শিকার ও ফলমূল সংগ্রহের 'সীমিত ভ্রাম্যমান' জীবনধারা ত্যাগ করে কৃষি ও পশুপালনের জন্য স্থায়ী বসতি-জীবন শুরু করল এবং পরবর্তী সময়কালে নগর সভ্যতা গড়ে তুলল।

সিন্ধু নদই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার জন্মদাতা। মানুষের প্রস্তর যুগের জীবন ছাড়ার যুগের শুরু। বোলন নদী তীরের **কাচি সমভূমি** এমনই জায়গা যেখানে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ-সুবিধা ছিল পর্যাপ্ত। মানুষ নদীর কূলে থাকতে শুরু করল। এখানে প্রথম শুরু হয় কৃষি ও পশুপালন। নদীর জন্যেই স্থায়ী বাস এবং প্রথম মানব সভ্যতার জন্ম। তাই নদীর কাছে চিরকালই ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা। পরম্পরা অনুসারে নদী দেবী। নদীকে ভারতবাসীরা প্রণাম করেন।

সিন্ধুনদ তার অববাহিকা অঞ্চলে যে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে বালুচিস্তানের মেহেরগড় সেই ব্যবস্থারই ('Indus system') অংশ। বোলন গিরিপথের পাদদেশে বোলন নদীর তীরে **কাচি সমভূমি**। নদীর দ্বারা প্লাবিত পলিমাটি কাচি সমভূমিকে করে অসাধারণ রকমের উর্ব্বর। উর্ব্বরতার জন্য আজও কাচি সমভূমিকে বলা হয় বালুচিস্তানের 'ভাতের হাঁড়ি' ('bread busket'–*Allchin(s), Origins of a Civilization* : 126)। এখানের উর্ব্বর মাটি জন্ম দিত পর্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ, লতাপাতা, বুনো শস্য প্রভৃতি যার আকর্ষণে হরিণ, বুনোভেড়া, শুয়োর প্রভৃতি যেমন এখানে আসত তেমনি এখানে থাকতে আসত নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ ভাল ভাল শিকারের আর বুনো শস্যের লোভে (প্রস্তর যুগের অস্ত্র, প্রাণী ও উদ্ভিদের সংগৃহীত জীবাশ্ম থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত)। জল, শিকার ও বুনোশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া এখানে সম্ভব ছিল। খাদ্য না থাকলে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে থাকতই না। প্রত্নবিজ্ঞানী জে. এফ. জারিজ এবং আর. আলচিন উভয়েই সংগৃহীত প্রত্ন নিদর্শন পরীক্ষা করে বলেছেন যে কৃষি শুরুর পূর্বেই মেহেরগড় ছিল নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের অধিকৃত স্থান ('occupational site of neolethic men')।

প্রত্নতত্ত্ব

১৯৭০ দশকের প্রথম দিকে পিরাকে খননকার্যের সময় প্রত্নবিজ্ঞানীরা মেহেরগড়ে পুরাতত্ত্বের নিদর্শনের গন্ধ পান। ১৯৭৪ সালে মেহেরগড়ে খননকার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই খননকার্যের দ্বারা হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক পটভূমি জানার চেষ্টা করা (*Jarrige* : 94)। যে ফরাসী প্রত্নবিজ্ঞানীর দলটি
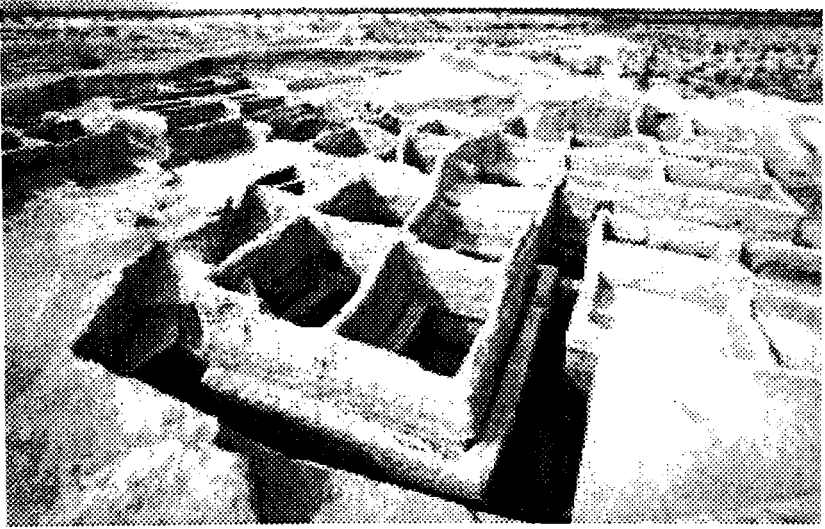
মেহেরগড় সভ্যতার পোড়া ইটের বাড়ির ভগ্নাবশেষ (ভারতবাসীর প্রাচীনতম সভ্যতা)

মেহেরগড় খনন কার্যের দায়ীত্ব গ্রহণ করে তার নেতৃত্বে (Director) ছিলেন জে. এফ. জারিজ। আর. আলাচিন, আর. মিডো, এল. কনস্‌টানটিনি, এম. লেচ্‌চিভেলিয়ার, জি. এল. পসীল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরাই মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নেপেলসে ১৯৭৭ সালে প্রত্নবিজ্ঞানীদের বিশ্বসভায় মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রত্নক্ষেত্রটি প্রায় ১৫০০ বিঘা (৫০০ একর)। খননকার্যের ফলে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে বহু নব্যপ্রস্তর যুগের এবং প্রাচীন (Early) হরপ্পা যুগের মানুষের তৈরি জিনিস। এখানে থাকত প্রস্তর যুগের মানুষ। তাদের উপনিবেশ ৯০০০ বছর থেকে (... 'the early settlement appears to date from 7000 B.C.–*Allchin* : 127)। তাদের থাকার ধারাবাহিকতা ছিল। নদীবন্যার সময়ে দূরে সরে যেত কিন্তু এই স্থানটিকে তারা সম্পূর্ণ ত্যাগ করত না। ('There is no clear indication that at any time there was a complete break or hiatus in the occupation'... *Allchin* : 127)। সুতরাং মেহেরগড় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভ্রাম্যমান প্রস্তর যুগের মানুষের একস্থানে থাকার ধারাবাহিকতা। পণ্ডিতেরা মেহেরগড় সভ্যতার সময়কালকে ৭টি ভাগে ভাগ করেছেন।

মেহেরগড় সভ্যতার সময়কাল (৯০০০—৪২০০ বছর)
(প্রত্নবিজ্ঞানীদের হিসাবে)

এখন থেকে বছর পূর্বে	মেহেরগড় সভ্যতা সময়কাল	
৯০০০	???	
৮৫০০	১ ক	মাটির বাসন তৈরি যখন অজানা ছিল
৮০০০		
৭৫০০	১ খ, গ	বন্যা হওয়া ও পলি পড়ার সময়কাল
৭০০০	২ ক, খ, ২ গ	তৈরির যুগঃ শস্যের খোসা ছাড়ান, শস্যগোলা বানান
৬৫০০		
৬০০০	৩	রঙীন মাটির বাসন, পোড়ামাটির বাসন, নারী মূর্ত্তি তৈরি, শস্য গোলা তৈরির যুগ
৫৫০০	৪—৫	
৫০০০	৬	
৪২০০	৭	

তিনটি ঢিবি ঃ প্রত্ননিদর্শন ও ব্যাখ্যা

মেহেরগড়ে তিনটি ঢিবি। ১ নং, ২নং ও ৩ নং ঢিবি। নদীর পলি জমে জমে তৈরি। এদের ভিতরে মাটির স্তরে স্তরে ৯—১০ হাজার বছর প্রাচীন ভারতের প্রস্তর যুগের এবং আদি সভ্য যুগের নিদর্শন ছিল রক্ষিত। বোলন নদীর জল এই ঢিবির উপরদিকের ১০ মিটার অংশ অপসারিত করার ফলে নব্য প্রস্তর যুগের সঞ্চিত নিদর্শনগুলি বেরিয়ে পড়েছে। নিদর্শনগুলি ৭০০০ বছরের যে প্রাচীন তা প্রমাণিত (১৪ সি কার্বন পরীক্ষার সঙ্গে আছে এম.এ.এস.সি.এ ক্যালিবারের উপাদান—জারিজ ঃ ৯৪)। ঢিবির উপরের মাটির স্তরে মানুষের থাকার নিশ্চিত সময়কাল যখন ৭০০০ বছর তখন নিচের স্তরে স্তরে মানুষের অবস্থানের সময়কাল ৯০০০ বছরের বেশিও যে হতে পারে সে বিষয়ে সকল প্রত্নবিজ্ঞানীরা একমত। ঢিবির উপর থেকে নিচে ৫ মিটারের বেশি স্তরের খননকার্য হয়নি। ফলে নিচের স্তরের নিদর্শনগুলির আবিষ্কার ও সময়কাল প্রমাণ করাও যায়নি।

তবে বিজ্ঞানী আলাচিন এক্ষেত্রে 'দূর অনুভব' ('remote sensing') পদ্ধতি অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

খননকার্য পাঁচটি ধাপে করার সুবাদে জানা গেছে যে এখানে মানুষের থাকার ধারাবাহিকতা ছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালের খননকার্যের ফলে জানা যায় যে এই সভ্যতার স্রষ্টারা তখনও মাটির বাসন তৈরি করতে জানতেন না। আবিষ্কার
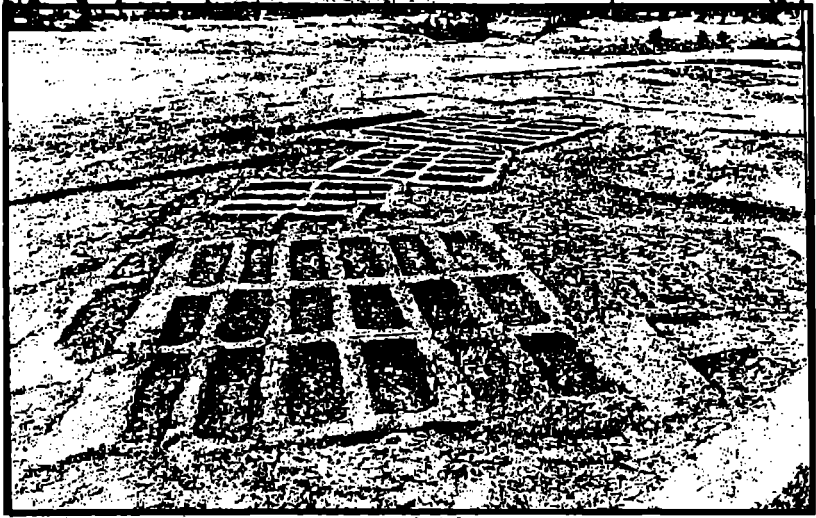
৭০০০ বছর প্রাচীন রোদে শুকানো ইটের কামরা মেহেড়গড়ে
—কৃতজ্ঞতা স্বীকার আলচিনের প্রতি

হয়েছে রোদে শুকানো ইটের তৈরি ছোট ছোট চৌকোনা কাঠামো, সঙ্গে আগুন জ্বালানোর জায়গা (fire place)। দুই বা চারটি করে কাঠামো। এগুলি বাড়ি ছিল বলে মনে হয় ('assumed to be houses'–*Allchin* : 129)। এখানে পাথরের ছুরি তৈরির শিল্প ('blade industry') আবিষ্কার হয়েছে। বিভিন্ন কাজেই তারা ছুরি ব্যবহার করত। পাথরের কতগুলি কাস্তের খন্ডাংশ, তাতে কাঠ বা হাড়ের হাতল লাগান ছিল। অনেকগুলি বিশেষ রকমের পাথর যা দিয়ে তারা শস্য গুঁড়ো করত তা পাওয়া গেছে। দুই রকমের বার্লির এবং তিন রকমের গমের খোসার ছাপ (মাটিতে) পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি ছাপ ছিল রুটির গমের ('bread wheat')। বিজ্ঞানী কোসটান্‌টিনি (L. Costantini) বার্লি, গম প্রভৃতি শস্যের খোসার ছাপ পরীক্ষা করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষির

বিস্তার ও বিকাশ শুরু হল ৮০০০ বছর সময়কালের শেষ থেকে।

১২টি মাটির বাসনের ভাঙ্গা অংশ পাওয়া গেছে। 'এগুলি মৃৎপাত্রের প্রথম নিদর্শন।' পরীক্ষা অনুসারে জারিজ বলেছেন যে ৮০০০ বছর প্রাচীন কাল থেকে মেহেরগড়ে মাটির বাসন তৈরি চলে আসছে (Jarrige : 96)। আলচিন ৭৫০০-৭০০০ সময়কালে হাতে তৈরি মাটির বাসনের ভাঙ্গা অংশ আবিষ্কার করেছেন (*Allchin* : 129)।

৩নং সময়কালে (এখন থেকে ৬০০০ বছর পুর্বে) পাথরের ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র, ক্ষুদ্র অস্ত্র তৈরির একটি শিল্পকেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫০০০ চকমকি পাথরের টুকরা পাওয়া গেছে। আগুন জ্বালতে চকমকি তারা ব্যবহার করত। চকমকির সংখ্যা থেকে জনসংখ্যার ধারণা করা যায়।

সভ্যতা সময়কাল ৬ (৫০০০ বছর থেকে) ঃ এই সময়ে মানুষের তৈরি একটি বেশ বিস্তৃত চারকোনা ইটের তৈরি বাড়ি আবিষ্কার হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছোট ১০টি ঘর বা খোপ। এগুলি শস্যগোলা ছিল। খোপগুলির মাটিতে বার্লি ও গমের খোসার ছাপ ছিল। একটি খোপে কাস্তে পাওয়া গেছে। খোপের একটি জায়গায় অন্যান্য শস্যের সংগে তুলা বীজও পাওয়া গেছে। যেহেতু শস্যগোলায় অনেক তুলাবীজ পাওয়া গেছে তা থেকে নির্ভুলভাবেই বলা যায় ৫০০০ বছর থেকে এখানে তুলাচাষ হতো। স্মরণ করা যেতে পারে যে হরপ্পা সভ্যতায় (যেমন রাজস্থানের কালিবঙ্গাতে) সুতাকাটার তকলি পাওয়া গেছে।

দামী পাথর কাটার একটি কারখানার ('workshop') প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে 'শস্যগোলার' দক্ষিণের দেওয়াল বরাবর। এই কারখানায় আছে অনেকগুলি পাথর ফুটো করার যন্ত্র (drill) এবং অন্যান্য যন্ত্র। গোলার দক্ষিণপাশে ছাইয়ের মধ্যে পাওয়া গেছে রাশী রাশী হাড়। এখান থেকে প্রায় ১০০ হাড়ের তীক্ষ্ণাগ্র তুরপুন সংগ্রহ করা হয়েছে। রাশী রাশী জীবজন্তুর হাড় সম্বন্ধে প্রত্নবিজ্ঞানী জারিজের অভিমত হল এখানে পশুবধ ও মাংসকাটার কাজ চলত এবং কাছেই ছিল একটি শিল্প কেন্দ্র যেখানে হাড়ের জিনিস তৈরি করা হতো। এবং সম্ভবত তুরপুনগুলিকে ব্যবহার করা হত পশুর চামড়ার জিনিস তৈরির কাজে। প্রস্তর যুগ থেকেই পশুবধ চলছে। ভারতের উন্নত ধর্মসংস্কৃতি পরবর্তী কালে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সমস্ত জীব রক্ষার প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছিল (দেখুন বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ, *সংস্কৃত রচনায়.... পরিবেশ-সচেতনতা*)।

এই (শস্য গোলা) বাড়ির চারদিকে কতগুলি সুন্দর বার্নিশ করা পাত্রের

রঙীন খোলামকুচি পাওয়া গেছে। অধিকাংশ পাত্রগুলি ন্যাসপাতি আকৃতির (পেটমোটা)। পাত্র তৈরিতে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগ আরম্ভ হল। ঘুর্ণন পদ্ধতি বা (কুমোরের) চাকা ঘুরিয়ে তৈরি শুরু এই বাসন। এই নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে মাটির বাসন-পাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিপ্লব ঘটল। রঙীন পাত্র তৈরিও শুরু হল। ৬ষ্ঠ ও ৫ম সহস্রাব্দের (সময়কাল নং ৩, ৪) যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কার হয়েছে তার তাৎপর্য খুব গভীর। এই সময়কালের নিদর্শন থেকে জানা যায় যে তখন কৃষি অর্থনীতি ('farming economy'), হস্তশিল্পে বিশেষীকরণ এবং মেহেরগড়ের সঙ্গে দূর দূরান্তের যোগাযোগ চলছে। কবরের মধ্যে আবিষ্কৃত গাঢ় নীলবর্ণ পাথরের পুঁতি সম্ভবত উত্তর বালুচিস্তানের পাহাড় থেকে এবং নীলকান্ত মণি (turquise) পূর্ব ইরাণ বা মধ্য এশিয়া থেকে তাদের আমদানি করতে হয়েছে (Jarrige : 97; *Allchin* : 131)। সামুদ্রিক প্রাণীর শক্ত খোলার (sea shells) নিদর্শন ইঙ্গিত দেয় যে দূর সমুদ্রের সঙ্গে তাদের তখন সম্পর্ক ছিল।

৪র্থ সহস্রাব্দের শুরু থেকেই মেহেরগড় হয়ে ওঠে (কুমোরের) চাকা ঘুরিয়ে ব্যাপক বাসন তৈরির একটি শিল্পকেন্দ্র। এই সময়ে তৈরি বাসনগুলি উন্নত রুচির শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। বাসনকে সুন্দর ও শিল্প সমৃদ্ধ করা হত জ্যামিতিক চিহ্ন বা পাখির ছবি বাসনের উপর এঁকে। কারখানায় চলত নীলপাথর, নীলকান্তমণি পাথর, বহু মূল্যবান পাথরের এবং সামুদ্রিক প্রাণীর খোলসের (shell) কাজ। এই ধরনের কাজগুলি হস্ত শিল্পের উন্নতি ও বিকাশেরই উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। "পুঁতির ধারেই ছোট ছোট ফুটো করার যন্ত্রের (drill) অবস্থান মনে রাখারই মত।" কারিগরি শিল্পনৈপুণ্যের প্রাচীনতম প্রমাণ হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই ফুটোকরার যন্ত্রগুলি (drills)। এগুলির মাথারদিকে ফাঁকা (যাতে নোয়ান যায়) এবং অত্যন্ত মসৃণ। এথেকে বুঝা যায় যে তারা ধনুক-ড্রিল (bow drill) ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে হরপ্পা সভ্যতার ধোলাভিরাতে ধনুক-ড্রিল আবিষ্কার হয়। ৪র্থ-৩য় সহস্রাব্দের যজ্ঞ বেদীও আবিষ্কৃত হয়। মেহেরগড়ের এই যুগটি ছিল প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির যুগ। উদাহরণ হল জই এবং নতুন রকমের এক শ্রেণীর গমের প্রথম আবির্ভাব।

৪নং সময়কাল হল (৫৫০০ বছর থেকে) মেহেরগড় অধিকার (occupation) শুরুর যুগ। এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল বসতবাড়ি। বাড়ির দরজা ছোট। উচ্চতাও কম। বসতবাড়িতে উঠোন আছে গৃহস্থালি কাজকর্ম করার

জন্য। বহু বার্লি-খোসার ছাপ উঠোনের মাটিতে এবং এখানে আছে শস্য রাখার অনেক বড় বড় ভাঙ্গা পাত্র (Jar)। উঠোনে লাল, সাদা এবং কাল রঙের জ্যামিতিক চিহ্নের সাজে সজ্জিত নানা রঙের সুন্দর মাটির পাত্র আবিষ্কার হয়েছে। অর্দ্ধেক মোচা আকৃতির বড় বড় পাত্র পাওয়া গেছে। এই পাত্রগুলিতেও জ্যামিতিক চিহ্নের নকশা। শিল্পের মূল বিষয় (motif) ছিল জ্যামিতি। জ্যামিতি চর্চা ভারতীয় সভ্যতার শুরু থেকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাদামাটা পাত্রের শতকরা অনুপাত বাড়তে থাকে যেমন ডিম্বাকৃতির পানপাত্র এবং শস্য রাখার টেকসই পাত্র। হরপ্পা সভ্যতায় বহু সিল ('seal') পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রথম পোড়ামাটির স্ট্যাম্প বা সিল এবং হাড়ের সিল মেহেরগড়েই ৫৫০০ বছর সময়কালে আবিষ্কার হয়েছিল।

৫২০০-৪৫০০ বছর সময়কালের (৪ নং, ৫ নং মেহেরগড় কাল) উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভারত-ইরাণ সীমান্ত অঞ্চল পারস্পরিক আদান-প্রদান ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া। মেহেরগড় এই মিথক্রিয়া এলাকারই অন্তর্গত। তখন বিক্রির জন্য প্রচুর পরিমাণে মাটির পাত্র ও পোড়ামাটির তৈরি জিনিস মেহেরগড়ের প্রধান কর্মযজ্ঞ। মেহেরগড়ে তৈরি ধূসর রঙের পাত্রের উপর কাল রঙ করা বিক্রির জন্য তৈরি এরূপ পাত্র কিলন এলাকার কাছে পাওয়া গেছে। 'হলুদ রঙ করা' ('painted in yellow'–Jarrige : 98) রকমারি অলঙ্কার পরিহিত পোড়ামাটির মানুষের মূর্ত্তি তখন তৈরি হত। এই মূর্ত্তিগুলির কেশচর্চ্চায় দেখা যায় বৈচিত্র্য। এগুলির কেশ বিন্যাস যেন 'ভদ্র সমাজেরই' ('sophisticatd society') প্রতিফলন। একটা বড় ইটের তৈরি মঞ্চ আবিষ্কার হয়েছে। জারিজের মতে এই মঞ্চটি স্মারক ভবনের সমাবেশ ('monumental complex') হতে পারে। এই সময়ে মেহেরগড়ে নগরায়ণের লক্ষণ দেখা যায়।

মেহেরগড়ে আবিষ্কৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম পরীক্ষার ফলাফল এতক্ষণ কিছুই বলা হয়নি কেবল খাদ্যশস্যের কথা ছাড়া। এখানে কুলজাতীয় নানারকমের ফলের এবং খেজুর গাছের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। প্রথমদিকে যখন মানুষ মাটির বাসন তৈরি করতে জানত না তখন বন্য প্রাণীর জীবাশ্মেরই প্রাধান্য ছিল ('half of the animals represented are wild'–*Allchin* : 132)। পোষমানা প্রাণী ছিল ছাগল, ভেড়া ও গরু। পোষমানা প্রাণী ৭০০০ বছর সময়কালে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই সময়ে পোষমানা গরুর জীবাশ্ম ৬০% (মোট জীবাশ্মের মধ্যে—*Allchin* : 133-4)। বর্তমান ভারতের অনেক

জায়গায় এই প্রাচীন প্রাণীর দ্রুত বিনাশ ঘটছে।

চারকোনা পোড়ামাটির ইট, ইটের বাড়ি, সিল, সুন্দর রঙীন মাটির বাসন, পুঁতি, পাথর ফুটো করার ড্রিল, বার্লি, গম, জই, তুলা উৎপাদন, কাপড় বোনা, শস্যগুঁড়ো করার পাথর, কুঁজগরু, ছাগল, ভেড়াকে গৃহপালিত করা, ১৮ সে.মি. দীর্ঘ পাথরের তৈরি ছুরি—ইত্যাদি যা উন্নত হরপ্পা সভ্যতায় ছিল তার অনেক কিছু মেহেরগড়েই প্রথম তৈরি শুরু হয়। প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে সভ্যযুগের সৃষ্টি করল সেই খবরই মেহেরগড় পৃথিবীকে জানিয়েছে। ৪৫০০ বছরের পূর্বেই হরপ্পা সভ্যতা এ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। মেহেরগড়ের ৮ কি.মি. দূরে নোশারো তখন উন্নত হরপ্পা সভ্যতায় পৌঁছেছে। এই সময়ে দেখা যায় মেহেরগড় এলাকা পরিত্যক্ত। মেহেরগড়ের মানুষ কোথায় গেল? হয়তো মেহেরগড়ের মানুষ নোশারোতে চলে গেল ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন বেশী সুযোগের জন্যে। অবশ্যই হরপ্পা সভ্যতারই অঙ্গীভূত হয়ে গেল মেহেরগড়ের মানুষের সভ্যতা ('Mehrgrah has produced a long history of man's adaption to the Indus Valley. This begins with the earliest settling by farming peoples and goes through the middle of the third millennium : Just prior to Ca. 2500 B.C. the site is integrated into the Early Harappan as defined by Dr. M. R. Mughal (1970). Mehrgrah is then abandoned. But, eight kelometres to the south, at Nosharo, there is a Mature Harappan site which indicates that the Kachi Plain was definitely a part of the Harappan territory.' (*Jarrige* : 98) ।

মেহেরগড় সভ্যতা ঃ ভারতে মূর্ত্তি তৈরি সংস্কৃতির প্রাচীনতম উৎস

মেহেরগড় সভ্যতা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম উৎস যদিও বর্তমানে বালুচিস্তানে সেই সংস্কৃতি এখন প্রায় বিলুপ্ত। ৭০০০ বছর ধরে মূর্ত্তি তৈরি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব্য প্রস্তর যুগের মেহেরগড়ের মানুষই মূর্ত্তি তৈরি সংস্কৃতির প্রথম জন্ম দেন। বেদীর উপরে মানুষের মূর্ত্তি এবং চতুষ্পদ প্রাণীর মূর্ত্তি মেহেরগড়েই প্রথম আবিষ্কার হয়েছে।

জারিজ লিখেছেন, 'সাত সহস্রাব্দ সময়কালের (মেহেরগড় সভ্যতার ২নং

সময়কাল) মাটির দুটি মানুষের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সেগুলি খুবই বিশেষ ধরণের, একটি বসা অবস্থায়, অন্যটির মাথা নেই। যে বেদীর উপরে মূর্ত্তিটি বসান সে বেদীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে ছোট ছোট ডিস্‌ক বেদীর চারদিকে এঁটে দিয়ে। আর একটি চতুষ্পদ প্রাণীর বিশেষ ধরণের টেরাকোটা মূর্ত্তি পাওয়া গেছে সেখান থেকে। ৩নং ঢিবির নব্যপ্রস্তর যুগের স্তর থেকে পাওয়া একটি মূর্ত্তির নিম্নাংশ সহ এই মূর্ত্তিগুলি প্রমাণ করে যে বালুচিস্তানের (অবিভক্ত ভারতের) প্রাচীনতম সংস্কৃতিতে মানুষ এবং পশুদের প্রতিমূর্ত্তি (বা প্রতিনিধিত্ব) আছে' ('Two human figurines in clay were also found. They are very stylized; one is in a seated position, the other, which is truncated, is decorated with small discs pasted around its base. Another terracotta figurine is of a stylized four-legged animal, and it comes from the same area within the site. These figurines, to which one must add a lower part of a seated example from the Neolithic levels of Mehrgrah Mound three, demonstrate that representation of humans and animals are to be found in the earliest cultural assemblages known in Baluchistan' (Jarrige : 97)। প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিন লিখেছেন, 'মাটি দিয়ে হাতে বানান কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি মানুষের মূর্তি ১নং সময়কালের শেষের দিকে (অর্থাৎ ৭৫০০ বছর সময়ের শেষভাগে) পাওয়া গেছে। আপাতদৃষ্টিতে যে বিশাল সংখ্যক পোড়ামাটির নারীমূর্ত্তি পরবর্তী সময়কালে মেহেরগড়ে পাওয়া গেছে এটি হল তাদেরই পূর্বসূরি ('ancestral prototype'–*Allchin* : 129)। দেখা যায় যে পরবর্তী সময়কালে বহু মূর্ত্তি তৈরি হয়েছে ও তৈরী চলছে। ৫৫০০ বছর সময় কালের
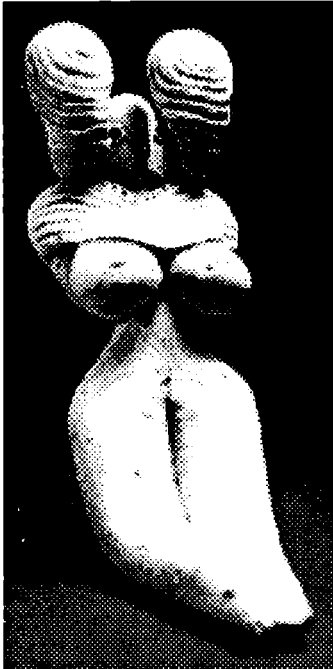
৫৫০০ বছরের প্রাচীন মূর্তি

তৈরি (৪ নং মেহেরগড় সময়কাল) নারীমূর্ত্তিগুলির স্তন দোদুল্যমান যার সাদৃশ্য আছে প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ (Chalcolithic) যুগের (মূর্ত্তির) নমুনার সঙ্গে ('The

female figurines, which still resemble the early Chalcolethic prototypes, now have pendulous breasts'–*Jarrige*)। মেহেরগড়ের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে ৪র্থ সময়কাল থেকে (৫৫০০ বছর থেকে) ছোট ছোট পোড়ামাটির নারী মূর্ত্তির এক উল্লেখযোগ্য অনুক্রম ঘটেছে। প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিন লিখেছেন, 'সকলেই সাধারণভাবে একমত যে এগুলি দেবীমূর্ত্তির প্রতীকস্বরূপ' ('Another special feature of Mehrgrah is that from period IV onwards a remarkable series of small female terracotta figurines occur. There is general concensus that these represent deities'–*Allchin* : 136)।
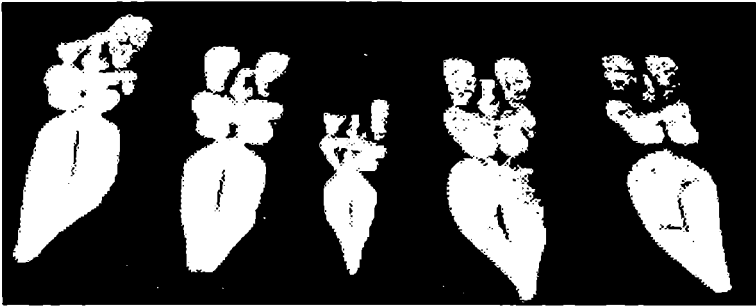
মেহেরগড়ের কয়েকটি দেবী মূর্ত্তির নমুনা
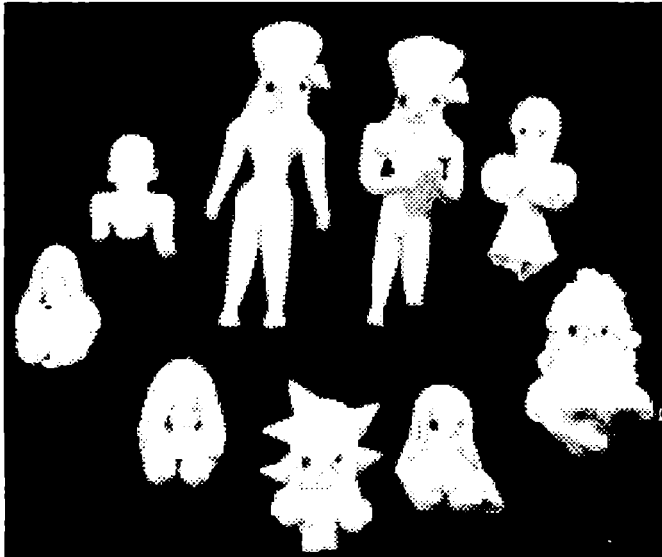
মেহেরগড় ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎপত্তিরই উদাহরণ। শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের 'সীমিত' ভ্রাম্যমান জীবনধারাকে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ কেন ত্যাগ করে ধীরে ধীরে কৃষি, পশুপালন, শিকার, বাড়িতে বসবাস করতে করতে এক 'পরিশীলিত সমাজের' ('sophisticated society') আবির্ভাব সম্ভব করল মেহেরগড় সভ্যতা সেই খবরই পৃথিবীকে জানাল। আবার একটি নদী চলতে চলতে যেমন আর একটি নদীতে গিয়ে মেশে মেহেরগড় সভ্যতার মানুষেরাও তেমনি হরপ্পা সভ্যতায় মিশে গেল। মেহেরগড় পরিত্যক্ত হল। নোশারোতে তখন হরপ্পা সভ্যতা উচ্চ শিখরে। মানুষের স্থান পরিবর্তনের ফলেই যেন সভ্যতার ভাঙ্গাগড়ার খেলা।

সাত হাজার বছরের প্রাচীন মানুষের ও প্রাণীর মূর্ত্তি মেহেরগড়ে পাওয়া গেছে। নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই মূর্তিতৈরির সংস্কৃতি ভারতের সংস্কৃতি ধারাতে বর্তমান। শুরু থেকেই মানুষ ও প্রাণীর প্রতিকী প্রতিনিধিত্ব ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। উল্লেখযোগ্য হল মেহেরগড়ে ৫৫০০ বছর সময়কালে **দেবীমূর্ত্তির** উদ্ভব। হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক সম্ভারে দেব, দেবী, পশু, পাখী, গাছ, লতাপাতা প্রভৃতির ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব লক্ষণীয়। এ সংস্কৃতি উপর থেকে চাপান বলে মনে হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ তার পরিবেশে যাদের দেখেছে তাদের মূর্ত্তি তৈরি ও সিল তৈরি করে মনের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করেছে। মূর্ত্তির বেদীতে 'ছোট ছোট ডিস্‌ক' এঁটে দেওয়া থেকে মনে হয় বেদীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া এবং বেদীর সৌন্দর্য সৃষ্টির ঝোঁক অতি প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। 'বেদী' পরবর্তীকালে 'পবিত্র বেদীতে' পরিণত হয়েছে।

. ৭০০০ বছর প্রাচীন মাটির মূর্ত্তির উৎপত্তি। ৭০০০ বছর ধরে মূর্ত্তি তৈরি, তা থেকে পৌত্তলিকতা। হিন্দুরাই দেব-দেবীর মাটির মূর্ত্তি তৈরি করে। মূর্ত্তি পূজার উদ্ভবের পূর্বে যে মূর্ত্তি তৈরির শিল্প সংস্কৃতি তা মেহেরগড় সভ্যতার স্রষ্টাদের সৃষ্টি। কোন রকম পূজার প্রচলন তখন মেহেরগড়ে ছিল কি ছিল না তা বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন ভারতের মেহেরগড়ের মানুষ মূর্ত্তি তৈরির যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন মুসলিম দুনিয়ার অন্তর্ভুক্তির পর মেহেরগড় তথা বালুচিস্তানে সে সংস্কৃতি সম্ভবত প্রায় নিশ্চিহ্ন। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে প্রাচীনতম মেহেরগড় সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বর্তমানে সেই ভারতবাসীর যে ভারতবাসী আজও মূর্ত্তি বানায়, মূর্ত্তিপূজা ও 'পবিত্র বেদী' পূজা করে।

ব্যাগহরে নব্য প্রস্তর যুগের বেদী আবিষ্কার

'পবিত্র বেদীর' প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে খননকার্যের ফলে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের স্তর থেকে উত্তর প্রদেশের সোন নদীর উপত্যকায় ১নং ব্যাগহরে। ৮৫ সে. মি. একটি গোল পাথরের বেদী (ring stone*) এবং

মাতৃ-অঙ্গ (যোনী) নকশা-পাথর একখন্ড ঐ বেদীর উপরে মাঝখানে রাখা। উল্লেখ্য, 'মাতৃ-অঙ্গ নকশা' পাথর প্রাকৃতিক, কৃত্রিম নয়। ব্যাগহর থেকে কিছু দূরে এই রকমের ন্যাচারাল নকশার ঐ পাথর পাওয়া যায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এখানের লোকদের মধ্যে গোল বেদীর উপর মাতৃ-অঙ্গ নকশার ঐ পাথর রেখে

*ring stone সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই পাথর অলৌকিক গুণসম্পন্ন (Marshall, V.1:62)।

পূজা করার রীতি এখনও প্রচলিত আছে। মনে হয় মাতৃপূজার রীতির উৎস নব্য প্রস্তর যুগ। স্বাভাবিকভাবে যা সম্ভব তা হল বেদী তৈরি ও মাতৃপূজা নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের রীতি ছিল। সে রীতি এখনও এখানে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ('Baghor I... is a primary upper palaeolethic site .... of the Son valley.' ...'the site also produced a roughly circular rabble platform of c. 85 cm. in diameter, in the centre of which was placed a piece of stone with natural lamination marks and resemblance to the shape of a vulva. Stones with such lamination marks are locally available ...The villagers... still place such stones on rubble platforms and worship them as manifestation of a mother goddess... Baghor I has produced the first upper palaeolethic shrine in India.'–Chakraborti : 45-6)। ব্যাগহরের নব্য প্রস্তর যুগের এই নিদর্শনকে প্রত্নবিজ্ঞানী জে. এম. কিনোয়ার 'মাতৃদেবী তত্ত্বের' মূল প্রতীকরূপে ('the mother goddess') ব্যাখ্যা করেছেন।*

নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই যেন মানুষ ধীরে ধীরে তার ভাবনা ও আচরণে পশু থেকে আলাদা হতে থাকল। পশু প্রকৃতির দাস। পশুর প্রবৃত্তি ও মানুষের আচরণের মধ্যে পার্থক্যের প্রমাণ পাওয়া গেল। পশুর যা ভোগ্যবস্তু মানুষের কাছে তা নয়। তার বিচার বিবেচনা আছে। মাতৃ অঙ্গ মানবের জন্ম স্থান। পবিত্র স্থান। পশুর মত মানুষ তাকে রাক্ষস, পিশাচ ও দানবের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হতে বাধা দিয়েছে। বেদের নরনারী ভোগ্য বস্তু নয়। কেউ ছোট বড় নয়। আবার রাক্ষসরাজ রাবণ যে পরস্ত্রীদের চুরি করেছিল ভোগের উদ্দেশ্যে তাকে বধ করা হল মহাকাব্যে। এই ধারা ভারতের। নব্য প্রস্তর যুগ এই ধারাটির উৎস বলে মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাতৃপূজা প্রায় সমস্ত ভারতেই প্রচলিত। অপরদিকে একটি সেমেটিক ধর্মমতে নারী 'ভোগ্যবস্তু' এবং 'মূর্ত্তিপূজার বেদী ঘৃণ্য বস্তু।'

---

*D. Chakraborti, *The Oxford Companion to Indian Archaeology*: 45–6

হরপ্পা সভ্যতা (৫৫০০--৩৩০০ বছর প্রাচীন) ঃ প্রাচীন পৃথিবীতে নগর সভ্যতার চরম বিকাশ ভারতে

প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিনের মতে স্থানীয় মানুষের (ভারতবাসীর) সৃষ্টি হরপ্পা সভ্যতা।* হর শব্দের অর্থ শিব। হরপ্পা নামে একটি গ্রামে প্রথম এই সভ্যতার আবিষ্কার হয়। তাই পণ্ডিতেরা এ সভ্যতার নাম দিয়েছেন হরপ্পা সভ্যতা। তারপর সিন্ধু নদীর উপত্যকার বহু স্থান খনন করে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতা সিন্ধু নদেরই দান। তাই সিন্ধু সভ্যতা নামেই বেশি পরিচিত। নগর-পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে এবং নগরায়ণের ব্যাপক বিস্তারে হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম। এই সভ্যতার বিস্তারও ঘটেছিল (১৫০০ X১২০০) ১৮ লক্ষ বর্গ কি.মি. এলাকায় (Dhabalikar, *Indian Protohistory*)। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে সিন্ধু সভ্যতা অপেক্ষা সরস্বতী নদী উপত্যকার সভ্যতা বেশী প্রাচীন। চার হাজার বছর পূর্বে সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই নদী উপত্যকায় হাজারের বেশী প্রাচীন সভ্যতা ক্ষেত্র বর্তমানে সনাক্ত হয়েছে। ফলে প্রাচীন ভারতের হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার ১৮ লক্ষ বর্গ কি.মি. নয়, তার অনেক বেশীই হবে। এই বিশাল এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে অতি উর্বর জমি হাসিল করেছিল ভারতবাসীরা। এই উর্বর জমির ফসল তাদের সম্পদশালী করে এবং এই সম্পদেই সম্ভবত সিন্ধু নগর সভ্যতার সৃষ্টি। পরবর্তীকালে ভারতবাসীর ধন সম্পদ লুঠ করতে বিদেশী আক্রমণ শুরু হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সে জমির অধিকার আজ আর ভারতবাসীর নেই।

হরপ্পা সভ্যতার ২৬টি প্রধান ক্ষেত্রে খনন কার্য করে প্রত্নতাত্ত্বিক হাজার হাজার নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। ভারতবাসীদের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীন পৃথিবীর অতি উন্নত এক সভ্যতার স্রষ্টা। ইতর প্রাণীরা পূর্বপুরুষদের পরিচয় জানে না। সেই জন্যই হরপ্পা সভ্যতার কয়েকটি আবিষ্কৃত ক্ষেত্র উল্লেখ করা হল ঃ (১) সর্তুঘাই, (২) দাবারকোট, (৩) যুদিইরযোদড়ো, (৪) নোশারো, (৫) পাতানি ডাম্ব, (৬) গুমলা, (৭) বালাকোট, (৮) মিরি কুয়ালাট, (৯) সুক্তজেন্ডোর,

---

* 'Indus Valley Civilization was indegeneous in origin... was the result of quantitative and gradual transformation of already existing culture... Pearson, GKS : 2007.

(১০) সোটকা কোহ, (১১) আহলাদিনো, (১২) মহেঞ্জো-দড়ো, (১৩) চানহুদড়ো, (১৪) গনউরিয়ালা, (১৫) হরপ্পা, (১৬) কালিবঙ্গা, (১৭) বানাওয়ালি, (১৮) বালু, (১৯) রাখিঘড়ি, (২০) হুলাস, (২১) লোথাল, (২২) সুরজোটদা, (২৩) ধোলাভিরা, (২৪) কুনটাসি, (২৫) বাগসরা, (২৬) নাগেশ্বর, (২৭) ভুনিকারান এবং (২৮) ভির্‌রানা (*Chakraborti* : 148)। জি. এল পসীল তাঁর *ইণ্ডাস এজ* গ্রন্থে হরপ্পা সভ্যতা ক্ষেত্রগুলি নথিভুক্ত করেছেন। বর্তমান হিসাব অনুসারে হরপ্পা সভ্যতার মোট ক্ষেত্র সংখ্যা ২৩১৭ টি। তার মধ্যে সরস্বতী নদী উপত্যকার সভ্যতা ক্ষেত্র ১০৭৪ টি। সুতরাং সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সভ্যতার ক্ষেত্র সংখ্যা ১২৪৩টি (S. P. Gupta, 'Indus Sarasvati...' in D. P. Sharma & M. Sharma (ed.), *Early Harappan...Civilization,* v.2:246-47)। উল্লেখ্য, ভব্যরাজা সিন্ধুতীরে বাস করতেন (ঋ.১/১২৬/১)।

ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃত হরপ্পা সভ্যতার যথাযথ বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টারা যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) প্রতি বাড়িতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের জন্যে গ্রিড (grid) প্যাটার্নে নগর পরিকল্পনা আবিষ্কার করে তাঁরা নগর নির্মাণ করেছেন। এই পদ্ধতি দ্বারা নগরের বায়ুমন্ডল নির্মল রাখা সম্ভব ('the roads cut each other angles an arrangement that helped the prevailing winds work as a suction pump, automatically clearing the atmosphere'–*encyclo. of the Ancient World* : 121)। গ্রিড প্যাটার্নের নগর নির্মাণ বর্তমান কালেও প্রচলিত। প্রাচীন পৃথিবীর অন্যকোন দেশের সভ্যতায় গ্রিড প্যাটার্ন অনুসারে নগর নির্মাণ যে হয়েছে তার প্রমাণ নেই। স্বীকার করতেই হয় যে নগর পরিকল্পনার এই কৌশল প্রাচীন ভারতবাসীর আবিষ্কার।

(২) তাঁরা কোরবেল্ড খিলানের (corbelled arch) আবিষ্কারক।

(৩) প্রতি বাড়িতে স্নানাগার, কূপ ও ঢাকা ড্রেনের সংযোগ করে সমস্ত নগরব্যাপী ড্রেনের ব্যবস্থা করেছেন; রাস্তায় যাতে জল না জমে সেইভাবে ড্রেন তারা তৈরী করেছেন। মহেঞ্জো-দড়োতে ৩০ ফুট চওড়া রাস্তার দুধারে একতলা, দোতলা অট্টালিকার সারি।

(৪) প্রাচীন পৃথিবীর চারটি সভ্যতার মধ্যে বৃহত্তম নগর নির্মাণ (মহেঞ্জো-দড়ো ২০০ হেক্টর) তাঁদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে ('The Indus civilization ...

the largest among the four...of the Old World'–UNESCO, *History*, V2:246)।

(৫) ১৮ লক্ষ ব. কি.মি. এলাকায় একই মাপের খুব ভালো পোড়া ইটের ব্যবহার করে হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার তাঁরা ঘটিয়েছেন।

(৬) তাঁরা জোর ও দশমিক সংখ্যার আবিষ্কারক। হাজার হাজার বছর ধরে জোর ও দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করে তাঁরা হিসাবের কাজ চালিয়েছেন।

(৭) প্রাচীন পৃথিবীতে তাঁরা এক নূতন লিপির জন্ম দিয়েছিলেন। এই লিপির নাম হরপ্পা লিপি। বিস্তীর্ণ হরপ্পা সভ্যতা এলাকায় এই লিপি তাঁরা প্রচলন করেন।

(৮) সমস্ত হরপ্পা এলাকায় তাঁরা এক ওজনের প্রবর্তক।

(৯) কূপ খননের কৌশল তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। এর জলে সম্ভবত কৃষিকাজ হত।

(১০) ধাতুদ্বারা তৈরি করাতের তাঁরা আবিষ্কারক।

(১১) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁতিগুলিকে এমনই এক আঁঠার সাহায্যে তাঁরা সেট করতেন যে প্রযুক্তি আজও অজানা।

(১২) একই ধরণের মৃৎ শিল্পরীতির তাঁরা প্রচলন করেন।

(১৩) তাঁদের তৈরী বাসন, মূর্তি, জীবজন্তুর, দেব-দেবীর মূর্তির সৌন্দর্য পৃথিবীর যে কোন দেশের সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয়।

(১৪) তাঁদের সংস্কৃতিতে গাছ, লতাপাতা, দেবদেবী, পশুপাখী, প্রকৃতির প্রায় সবকিছুরই প্রতিনিধিত্ব ছিল ব্যাপক ভাবে।

(১৫) ভারতের হরপ্পা সভ্যতা সিল (seal) তৈরি আবিষ্কার করে এমন সুন্দর সুন্দর পশু, পাখী, দেবদেবীর দৃশ্য নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যা সমকালীন পৃথিবীর অন্যকোন দেশে দেখা যায় না।

(১৬) এই সভ্যতার মানুষ তুলা ও পশমের বস্ত্র তৈরী করে মানুষের নগ্ন জীবন দূর করেছিলেন। এটাই সভ্যতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।

(১৭) এই সভ্যতার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল চাকা যা আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম উপকরণ।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি দিক হল মহেঞ্জো-দড়োর স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সাংস্কৃতিক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের পরিমাণ যদিও অতি বিশাল ও পর্যাপ্ত, কিন্তু

অস্ত্রের আবিষ্কৃত সংখ্যা অতি নগন্য। কোন সিলে বা মূর্তিতে রাজা/শাসক/সৈন্য/সেনাপতিকে প্রায় দেখাই যায়না। সামরিক শক্তিই এ সভ্যতার ভিত্তি যে ছিল না সেই প্রমাণই আমরা পাই। তবে নরহত্যা ছিল না তা বলা যাবে না। একটি সিলে (১৫০০টির মধ্যে) নরহত্যার লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট।

পৃথিবীর বহু প্রত্নবিজ্ঞানীকে হরপ্পা সভ্যতা গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। অনেকেই এই সভ্যতা গবেষণা করে বিস্মিত হয়েছেন। সম্ভবত গবেষক, ডি. ডি. কোশাম্বী ছাড়া আর কেউই এ সভ্যতাকে 'বর্ব্বরতা' বলেননি ('Civilization and Barbarism in the Indus Valley'–D.D. Kosambi, *An Introduction... Indian History* : 53)।

সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিনের মূল্যায়নই যথার্থ। তিনি লিখেছেন, 'যাহাই হোক না কেন সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্ব এখন পর্যন্ত উভয় দিক থেকেই অসামান্য কারণ এ যেমন এক মহান ও অতি বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক সাফল্যের প্রতিনিধিত্ব করে অপরদিকে দেখা যেতে পারে যে এ সভ্যতা হল প্রাচীন এমনকি আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার অনেক দিকেরই গঠনমূলক আদর্শ' ['Its (Indus Valley Civilization's) importance is, however, still unique both because it represents a great and astonishing cultural achievement and because it may be seen as the formative mould for many aspects of classical and even modern Indian Civilization'.–B. Allchin & R. Allchin, *The Birth of Indian Civilization* : 127]। এই অভিমতই যে খাঁটি বর্তমান আলোচনা থেকেই আমরা তা বুঝতে পারব। মাত্র একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গ্রিড প্যাটার্নে নগর নির্মাণ পদ্ধতি আধুনিক কালেও অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

সরস্বতী সভ্যতা
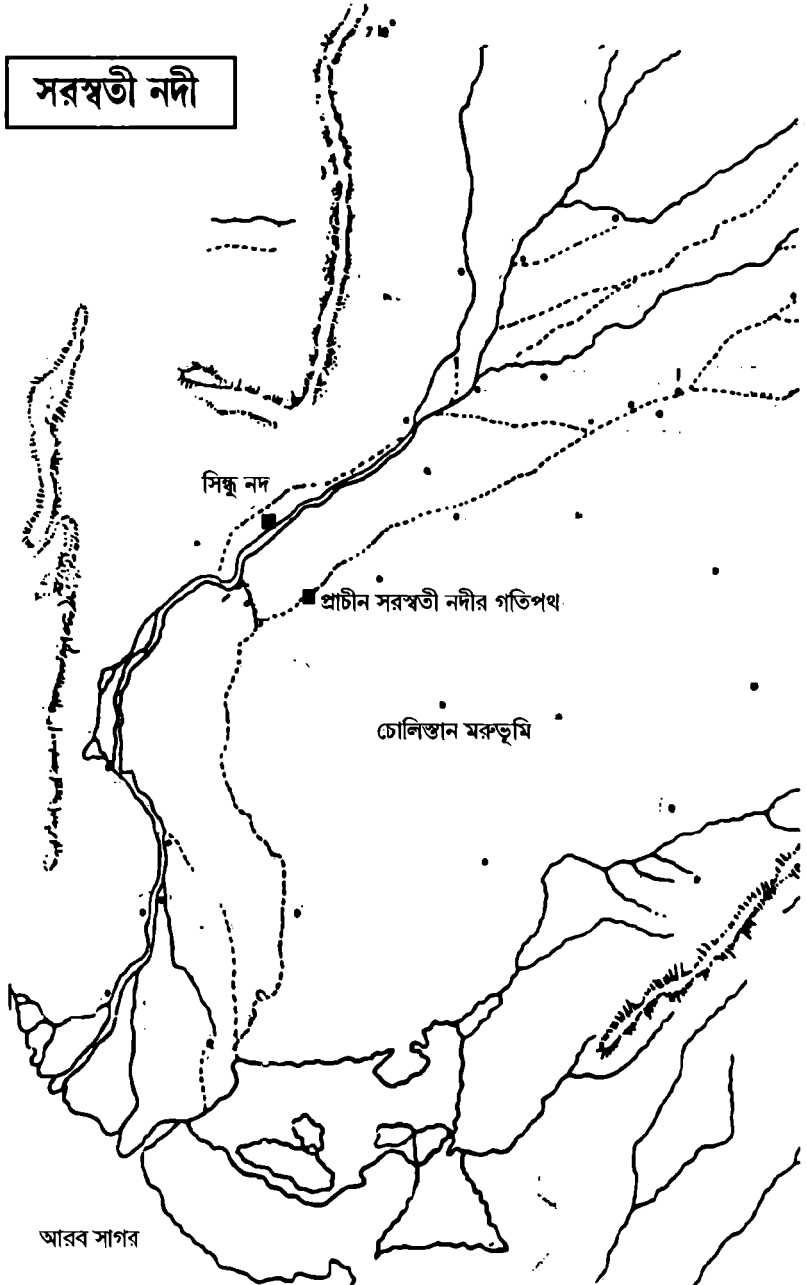
সরস্বতী সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতা অল্প-স্বল্প জানা কিন্তু সরস্বতী সভ্যতা আমাদের প্রায় সবই অজানা। আমরা প্রাচীন ঋষিদের প্রায় ভুলেই গেছি যদিও তাঁরা মানব জাতির কল্যাণের পথপ্রদর্শক ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষিদের জন্যই পৃথিবীর মানুষ ভারতের সরস্বতী সভ্যতার কথা জানতে শুরু করেছেন। সরস্বতী সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আছে ৬০টি ঋক বা মন্ত্র যে মন্ত্রগুলিকে বিজ্ঞানীরা পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে প্রাচীন কালে বিনাশপ্রাপ্ত সরস্বতী নদীর সভ্যতাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি বোলন, সিন্ধু, সরস্বতী ও অন্যান্য নদীরই দান। সরস্বতী সভ্যতা সরস্বতী নদীরই দান যেমন সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু নদের দান। বিজ্ঞানীদের প্রমাণ অনুসারে সরস্বতী নদী যখন ছিল তখন তার সভ্যতাও ছিল সিন্ধু সভ্যতার মত বিশাল এলাকায়। সরস্বতী নদীর বিনাশ হলে সরস্বতী সভ্যতারও বিনাশ ঘটল। নদীর জন্যই প্রাচীন ভারতে সভ্যতার জন্ম। একথা মিশরের নীলনদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি সত্য সরস্বতী, সিন্ধু ও বোলন নদীর ক্ষেত্রে। আমাদের বিভ্রান্ত করতে প্রচার করা হয় যে বিদেশীরা এসে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। নদীর জন্যই যে ভারতে প্রস্তর যুগ থেকে সভ্যতার যুগে উত্তরণ সেকথা বলা হয় না।

ঋগ্বেবেদে সরস্বতী কেবল নদী নয়, সরস্বতী নদী-দেবী, তাঁর স্তুতি আছে। সরস্বতী অগ্নি ও ইন্দ্রের মত প্রধান দেব-দেবীর একজন। যেহেতু সরস্বতীর কৃপায় অফুরন্ত ধন-সম্পদ এবং মানব সভ্যতা সংস্কৃতির সৃষ্টি সেইজন্য সরস্বতী বিদ্যা-বুদ্ধি ধন ও জ্ঞানের দেবী রূপে পূজিতা। সরস্বতী মা হলেন, মাতৃদেবী রূপে মূর্তিতে পরবর্তীকালে পূজীতা হলেন। নদী থেকে উৎপত্তি বলে জলদেবীর হাঁস, পদ্ম শ্বেতবর্ণা ইত্যাদি। সরস্বতী বাক-দেবী। সরস্বতী নদী উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ দান করেছিল সেই পরিবেশের জন্য বিদ্যাচর্চ্চা তথা বেদের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। ঋগ্বেদ নিজেকেই সরস্বতীর সন্তানরূপে অভিহিত করেছে।* ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির এই সুপ্রাচীন বৈদিক ধারাটি এখন ক্ষয়িষ্ণু। যেমন ভারতবাসীর বাসভূমিও ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে।

সরস্বতী নদীর উৎপত্তি ও গতিপথের সমাপ্তি

'একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ'। (ঋ. ৭/৯৫/২)

'Pure in her course from mountains to

*N.S. Rajaram, 'Sarasvati : River and Civilization' : 466

the ocean, alone streams of Sarasvati hath listened.' (tr. Griffith)
নির্মল তার ধারা পর্বতমালা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত,
একমাত্র সরস্বতী স্রোতধারা (স্তব) অবগত হয়েছেন। (অনুবাদক লেখক)
ঋগ্বেদের এই সূক্তাংশ অনুসারে (১) সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল (হিমালয়) পর্বতমালা এবং গতিপথের শেষ সমুদ্র পর্যন্ত। (২) সরস্বতী উপনদী বা শাখা নদী ছিল না। সরস্বতী ছিল একটি প্রধান নদী।

সরস্বতী ও সিন্ধু দুই স্বতন্ত্র নদী

'ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পুরুষ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।। ৫
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎস্বা সরথং যা ভিরীয়সে'।। ৬
(ঋ. ১০/৭৫/৫-৬)

'হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতি ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুদ্‌বৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুষোমা সংগত আর্জীকীয়া নদি! তোমরা শ্রবণ কর।'
—(অনুবাদ ড.রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋ ১০/৭৫/৫)

'হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদির সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রমু ও গোমতিকে, কভা ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সাথে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক।' (অনু. ড.দত্ত, ঋ. ১০/৭৫/৬)। ঋগ্বেদে এখানে প্রাচীন ভারতের ২০টি নদী ও শাখানদীর নাম পাই।

সরস্বতী নদীর নাম ৫নং এবং সিন্ধু নদের নাম ৬নং ঋকে উল্লেখ করেছেন সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি। সিন্ধু ও সরস্বতী যে দুইটি ভিন্ন নদী তা সুস্পষ্ট। একথা বলা প্রয়োজন এই জন্যে যে কেহ কেহ সিন্ধু ও সরস্বতী নদীকে অভিন্ন নদীরূপে বিবেচনা করেছেন। সরস্বতী যে সিন্ধু নদীর শাখানদী সে ইঙ্গিত কোথাও নেই।

সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থান

৫ নং (১০/৭৫) ঋকে ভারতের পূর্বদিক থেকে প্রথমে গঙ্গা, তারপর যমুনা, তারপরে সরস্বতী, তারপরে শতদ্রু নদীর নাম উল্লেখ করেছেন ঋষি। পূর্বদিক থেকে পরপর নদীর নামগুলির মধ্যে তৃতীয়টি সরস্বতী নদীর নাম। সুতরাং সরস্বতী সিন্ধুর পূর্বদিকের নদী। '৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্বদিকের...৬ ঋকে পশ্চিম

দিকের' নদী ও শাখা নদীর নাম আছে*। উল্লেখ্য, ৫ ঋকে সরস্বতীকে শাখানদী বা উপনদী বলা হয়নি। সরস্বতীকে নদী বলা হয়েছে। ৫নং ঋক্ থেকে নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় যে সরস্বতী ছিল যমুনা ও সুতলেজ (শতদ্রু) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমিতে প্রবাহিত।

সরস্বতী নদীর প্রকৃতি

সরস্বতী নদীর প্রকৃতি ব্যক্ত হয়েছে ভরদ্বাজ ঋষির কণ্ঠে—'এই নদীরূপী সরস্বতী মৃনালখননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান্ তরঙ্গসহকারে পর্বতসানু সকল ভগ্ন করিতেছেন' (ঋ. ৬/৬১/২, অনু. ড.দত্ত)। সরস্বতী ছিল প্রবল বেগবান ও বলশালী নদী। 'পর্বতসানুসকল' ভগ্ন হত সরস্বতীর তরঙ্গে। যাঁহার (সরস্বতীর) অপরিমিত অকুটিল দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিচরণ করে (ভরদ্বাজ ঋষি, ঋ. ৬/৬১/৮)।

সভ্যতা সৃষ্টিতে সরস্বতীর অবদান

প্রাচীন পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল বিশেষ বিশেষ নদীর যে সমস্ত গুণের জন্যে সরস্বতী নদীর সেই সবগুণই পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তবে সরস্বতীর ব্যতিক্রমি আচরণেরও উল্লেখ আছে (৬/৬১/২)।
মধুচ্ছন্দা ঋষির ঋক্‌টি লক্ষ্যণীয়—
'সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন' (ঋ. ১/৩/১২)।
জল সম্পদ ছাড়া সভ্যতা সৃষ্টি অসম্ভব। সরস্বতী 'প্রভূত জল সৃজন' অর্থাৎ পর্যাপ্ত জলের যোগান দিত। সেইজন্যে মানব সভ্যতার উদ্ভব সরস্বতী উপকূলে সম্ভব হয়েছিল যেমন বোলন ও সিন্ধু নদের উপকূলে সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল।
ভরদ্বাজ ঋষির নিম্নোক্ত ঋক্‌টি অনুধাবন করলে ভারতের সভ্যতা সৃষ্টিতে সরস্বতী নদীর অবদান বুঝতে অসুবিধা থাকে না।
....'হে অন্নসম্পন্না সরস্বতী দেবি! তুমি মানবগণকে ভূমি প্রদান করিয়াছ এবং তাহাদিগের জন্য বারিবর্ষণ করিয়াছ' (ঋ. ৬/৬১/৩, অনু. ড.দত্ত)।

সরস্বতীকে 'অন্নসম্পন্না' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে 'অন্ন' শব্দটি আছে অসংখ্যবার। বেদে 'অন্ন' বলতে খাদ্য সম্পদ বুঝায়। মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য সম্পদ 'অন্ন' শব্দদ্বারা বুঝান হত। 'ভূমি প্রদান' অর্থে সরস্বতীর তৈরি করা ভূমিকে প্রদান করা বুঝতে হবে। সরস্বতী তার পলিমাটি দিয়ে অতি উর্বর কৃষিজমি তৈরি করে

*দেখুন ড.দত্ত, টীকা নং ১ ও ২, পৃ. ১২৩৭

মানুষকে দান করেছিল এবং কৃষির ও পানীয় জলেরও পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করেছিল। উদ্বৃত্ত কৃষি সম্পদই সভ্যতা সৃষ্টিকে সম্ভব করেছিল বলে মনে হয়।

৪নং ঋকে ভরদ্বাজ ঋষি সরস্বতী নদীর গুণ পুনরায় ব্যক্ত করেছেন।

'দানশালিনী, অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী
সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করেন।'

(ঋ. ৬/৬১/৪)

কীর্ত্তিনাশা নদী মানুষের বাড়ী-ঘর-সভ্যতা ধ্বংস করে আবার কোন কোন নদীর কল্যাণে সভ্যতা সৃষ্টি হয়। ঋষিমন্ত্র অনুসারে সরস্বতী 'দানশালিনী, অন্নসম্পন্না'। সরস্বতী খাদ্যসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ মানুষকে দানে সমর্থ ও দান করতো বলেই সরস্বতী সকলের রক্ষাকারিণী নদী। খাদ্য ও ধনসম্পদ দানের জন্য 'রক্ষাকারিণী' বলা হয়েছে। ৬নং ঋকেও ভরদ্বাজ ঋষি সরস্বতীকে 'হে অন্নশালিনী, দেবি সরস্বতি!' এইরূপে অভিহিত করেছেন। সরস্বতী যে তার উপকূলবাসীদের খাদ্যসম্পদ দ্বারা লালন-পালন করত একথা নির্ভুলভাবে মনে করা যেতে পারে।

নদীর গুণে যেমন প্রচুর ফসল জন্মে তেমনি বাড়তি ফসলের দ্বারা সভ্যতা তৈরি হয়। সরস্বতী নদী নদীগুলির মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। বোলন নদীর কাচি সমভূমি ত্যাগ না করে যেমন নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে গিয়ে মেহেরগরে সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল, ঠিক তেমনি সরস্বতীর নদীতীরবাসীরা তথায়ই চিরকাল বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ যে করতেন তা ভরদ্বাজ ঋষির ঋকে ব্যক্ত ঃ

হে সরস্বতি! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও... আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্টস্থানে গমন না করি। (ঋ. ৬/৬২/১৪, অনু., ড. দত্ত)

সরস্বতী উপকূলবাসীদের মনে চিরস্থায়ীভাবে সরস্বতী উপকূলে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ এই ঋকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। স্থায়ী বসবাসের ফলে সভ্যতার সৃষ্টি। ১৩নং ঋকে সরস্বতীর কীর্ত্তির কথাও আছে।

'যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিদ্বারা ইহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ...যিনি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণশালিনী হইয়াছেন, সেই সরস্বতী জ্ঞানী স্তোতার স্তুতিভাজন হয়েন' (ঋ. ৬/৬১/১৩)।

এই ঋকে 'কীর্ত্তি' শব্দটি দ্বারা সরস্বতীর উর্বরভূমি দানে ও ভারতবাসীর দ্বারা যে ভারতের অন্যতম সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তাই মনে হয়। তাছাড়া আর কি মনে হতে পারে?

তবে সরস্বতী উপকূলে কোন সময়কাল থেকে যে মানুষ স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছিল ঋগ্বেদের তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও ঋগ্বেদের পূর্বপুরুষ অনেক কাল পূর্ব থেকেই যে বসতি শুরু করেছিল সে ইঙ্গিত আছে। যেমন ভরদ্বাজ ঋষির উচ্চারিত ঋক্‌টি—'**সপ্ত নদীরূপ সপ্ত ভগিনী সম্পন্না**

প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সেবিতা আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদিগের স্তুতি ভাজন হন।' (ঋ. ৬/৬১/১০)

আমাদের কাছে ঋগ্বেদের ভরদ্বাজ একজন প্রাচীন কালের ঋষি। তাহলে ভরদ্বাজের কাছে যাঁরা 'প্রাচীন ঋষিগণ' তাঁরা যে ঋগ্বেদ রচনার বহু কাল পূর্ব থেকে সরস্বতী নদীতীরে বাস করতেন তার প্রমাণ এই ঋক্ থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঋগ্বেদের ঋষিদের সময়কালের পূর্ব থেকে সরস্বতী উপকূলে ঋষিদের বসতি শুরু হয়েছিল। ঋগ্বেদের ঋষিদের পূর্ববর্তী গুরুরাও যে সরস্বতী তীরে বসবাস করতেন সেকথাই বলা হয়েছে।

প্রাচীন পৃথিবীর অনেক রাজা, রাজ্য, জনপদ ও সভ্যতা ভারতের সরস্বতীর অবদান। পৃথিবীরই প্রাচীন একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন নহুস। তিনি রাজ্য চালাতেন সরস্বতী নদীর উপকূলে। বাস করত ঐতিহাসিক 'পুরু' জাতির লোকেরা। চিত্র ও অন্যান্য রাজারা বাস করতেন।

বসিষ্ঠ ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত—

'রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নহুষায়'॥ (ঋ. ৭/৯৫/২)

'Thinking of wealth and the great world of creatures, she (Sarasvati) poured for Nāhusa her milk and fatness'. (tr. Griffith, p. 381)

সম্পদের ও বিশাল বিশ্বের জীবদের (কল্যাণের) কথা ভেবে সরস্বতী নহুসকে খাদ্যসম্পদ ঢেলে দিয়েছিলেন। (অনুবাদ ঃ বর্তমান লেখক)

সরস্বতী সমস্ত জীবের জন্য নহুস রাজাকে পর্যাপ্ত খাদ্যসম্পদ দান করেছিলেন। সরস্বতীর অবদানের জন্য এই রাজা ও রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। চিত্র রাজা নামে অন্য একজন বিখ্যাত রাজা রাজত্ব করতেন সরস্বতীর উপকূলে।

'চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রমযুতা দদৎ।' (ঋ. ৮/২১/১৮)

'অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেঘ ও বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্র রাজাই সহস্র অযুত ধন দানদ্বারা তাহাদিগকে (প্রজাদের) প্রীত করেন' (অনু. ড. দত্ত)। 'অন্য' রাজাও যেমন 'ভবরাজ্য' সরস্বতী তীরে যে রাজত্ব করতেন সে কথা জানা যায় ঋগ্বেদ থেকে (সূত্র ঃ ঋ. ৮/২১/১৮; ১২৬/১)।

সরস্বতী উপকূলে বসবাসকারি সকল মানুষের গৃহের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা দেখি ঋগ্বেদের ঋষি ভরতের অপত্য দেবশ্রবা দেবরাত ঋষির কণ্ঠে—

'হে অগ্নি! তুমি দৃষদ্বতী, অপষা ও সরস্বতী তীরস্থিত মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও।' (ঋ. ৩/২৩/৪, অনু. ড.দত্ত)

সরস্বতী নদী উপকূলে বসবাসকারি 'পঞ্চ জাতা' অর্থাৎ 'পঞ্চ শ্রেণীর'

মানুষের 'সমৃদ্ধি বিধায়িনী সরস্বতী' দেবীর স্তুতি দেখি ("এখানে 'পঞ্চ জাতা' অর্থে সায়ন চারি জাতি ও নিষাদ করিয়াছেন"—ড. দত্ত : পৃ. ৬৯৭)।

সরস্বতীর বিনাশ

যে সরস্বতী ছিল নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই নদীর দুঃখজনক পরিণতি জানা যায় পরবর্তী যুগে বৈদিক সাহিত্যে। সরস্বতীর স্রোতধারা অতি ক্ষীণ হল। তার স্রোত আর সমুদ্রে পৌঁছায় না। সরস্বতী নদী চোলিস্তানের মরুভূমিতে (বর্তমানে পাকিস্তানে) গিয়ে বিনাশ হল। মৃত সরস্বতী নদীর নামে 'বিনশনতীর্থ' স্থানের নাম আছে মহাভারতের শল্য পর্বে এবং প্রাচীনকালে সরস্বতীর তীরে বিশাল যজ্ঞের উল্লেখ আছে মহাভারতে।

সরস্বতী নদীর বিলুপ্তি—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রমাণ :

বিলুপ্ত সরস্বতীর অতীতের প্রাকৃতিক সমতুল (physical equivalent) আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিষয়টি জরিপ সংস্থাপক ভূতত্ত্ববিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী ভি. এম. কে পুরি ও বি.সি. ভার্মার নেতৃত্বে যমুনা ও মারকণ্ড নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ক্রম পর্যায়ে উচ্চতা বিশিষ্ট চারটি সমতল আবিষ্কৃত হয়। এগুলি সমুদ্র মিন লেভেল ("sea mean level") থেকে ৬৬০ এম উপরে। বিজ্ঞানীরা তাঁদের সিদ্ধান্তে বলেন যে সুদানওয়ালা, বাটা, গরিবনাথ ও মারকন্ডে প্রমাণ আছে যে পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম দিকে একটি নদীধারা ছিল। অধিকন্তু, পন্টাভেলিতেও পরিষ্কার প্রমাণ আছে যে বর্তমান যমুনা নদীর পূর্বে একটি প্রধান নদীপথ ছিল আরও উঁচু সমতলে যার প্রবাহ পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। এই গতি পথটির চিহ্ন শিবালিক সমতলে ক্ষয়সাধনের ফলে মুছে গেলেও দক্ষিণ শিবালিকে আদি বদ্রি সংযোগ স্থলে এই ধারার দ্বারা সমতল সৃষ্টির চিহ্ন এখনও আছে দক্ষিণ শিবলিক অঞ্চলের ঠিক পূর্বে আদি বদ্রি-মারকন্ডের সংযোগস্থলে।

"মৃত সরস্বতীর 'উৎস' অনুসন্ধান করতে আরও উপরে টোন নদীর জলাধারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে (যেখানে স্ফটিক মণি ও রূপান্তরিত শিলার প্রাধান্য) বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে টোন নদী প্রচণ্ড জলরাশি পাচ্ছে হিমবাহগুলি থেকে। সরস্বতী, জমাদার, সুপিন ও অন্যান্য হিমবাহগুলির সম্মিলিত জলরাশির ধারার শেষ পরিণতিতে সৃষ্টি সরস্বতী নদী। নাইটওয়ারের কাছাকাছি এলাকায় হিমবাহগুলির বরফ গলে জলে পরিণত হওয়ার ফলেই এই নদী সৃষ্টি।"* সুতরাং ঋগ্বেদের বসিষ্ঠ ঋষির ঋকে

---

*"Looking further up for the 'source' of this mighty river which is now 'lost' one's attention is naturally drawn to the basin of the Tones where quartzite and metamorphic

এবং যে কথা—'পর্বতমালা থেকে... সরস্বতীর স্রোতধারা'... (ঋ. ৭/৯৫/২) তা ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয়ত, সিন্ধুক্ষিৎ ঋষির ঋকে আছে যে সিন্ধুর পূর্বদিকে সরস্বতী নদীর অবস্থান যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। বর্তমান কালেও সরস্বতী নদীর এক ক্ষীণ ধারা (বিশেষত বর্ষাকালে) আছে ঐ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। এখনও শিবালিক পর্বতের পাদদেশ থেকে দক্ষিণদিকে হরিয়ানার পিপলি, কুরুক্ষেত্র ও পিহোয়া শহরের পর ঘাঘর নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলতে চলতে সিরসাতে গিয়ে শুকিয়ে গেছে। এখানে নদীগর্ভ শুকনো। তারপরে এই নদীর গতি যখন উত্তর রাজস্থানে, তখন নাম তার ঘাঘর, এর পরে বর্তমান পাকিস্তানের চোলিস্তান মরুভূমির ভাওয়ালপুর জেলার দেরাওয়ার ফোর্টের কাছে গিয়ে সরস্বতী অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু মরুভূমির মধ্যেও এই নদীর গতিপথ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। তারপরে এই নদী দক্ষিণ দিকে গিয়েছে এবং রাণী, ওয়াহিন্দা ও নারা নামে শাখা নদী সৃষ্টি করে কচ্ছের রানে গিয়ে আরব সাগরে মিশেছে। ভারতে সরস্বতী নদীর উৎস অনুসন্ধান করেছিলেন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী ভি.এম.কে. পুরি এবং বি.সি. ভার্মা। এই বিজ্ঞানীদের জন্য সরস্বতী নদীর উৎসের চমৎকার মানচিত্র পাওয়া সম্ভব হল। অনুসন্ধানকার্যের জন্য প্রত্নবিজ্ঞানী বি.বি.লাল, এ. ঘোষ ও থাপারের নাম উল্লেখযোগ্য। কে. এফ. দিক্ষিত অনুসন্ধান করেন সুতলেজ নদী, কে. এন. দালাল করেন অনুপগড় অঞ্চলে। সুরজ ভান হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে ঘাঘর নদী (সরস্বতী) অনুসন্ধান করেন। সুরজ ভানের সঙ্গে জেম. জি. সাফারও ছিলেন ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত।

পাকিস্তানে সরস্বতী সভ্যতা

চোলিস্তান মরুভূমিতে প্রাচীন ভারতবাসীর সভ্যতা আবিষ্কার ঃ

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ফলে সিন্ধু নদ যেমন আর ভারতবাসীর রইল না তেমনি চোলিস্তান মরুভূমি পাকিস্তান অধিকৃত হওয়ার ফলে সেখানেও আর

---

rocks dominate. 'All the evidences' Puri and Verma affirm, 'point to only one conclusion that the present-day Tons was in fact Vedic Sarasvati in its upper reaches.'

The tremendous amount of water that the Tons and other rivers receive must have come from glaciers. These scientists have produced an excellent map which shows that the Vedic Sarasvati was the ultimate outflow from a combination of glaciers which included, amongst others, the ones known as the Sarasvati, Jamadar and Supin glaciers. It was near Naitwar that these glaciers finally mented to form the river." (Quoted in B.B. Lal : 263)

ভারতবাসীর অধিকার থাকল না। চোলিস্তান মরুভূমি চরম শুষ্ক আবহাওয়া অঞ্চল। অতি প্রাচীন কালে এখানে মরুভূমি ছিল না। ছিল প্রাচীন ভারতের 'শ্রেষ্ঠ' নদী, বিশাল তার জলরাশি, উপকূলের অতি উর্বর মাটি, রাজা, রাজ্য, জনপদ এবং এক উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি। যে নদীর দানে এই উন্নত সভ্যতা সেই নদীই ঋগ্বেদের সরস্বতী। পাকিস্তানে নাম তার হাকরা ভারতে ঘরঘরা।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ঃ

১৯৪১ সালে স্যার অরেল স্টেইন সরস্বতী নদী থেকে জীবাশ্ম সংগ্রহ করে নদীর গতিপথের অনুসন্ধান করেন। ১৯৫৫ সালে স্টেইনের রেখে যাওয়া চিহ্ন অনুসরণ করে হেনরি ফিল্ড চোলিস্তানের মরুভূমিতে সরস্বতী নদীর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন। প্রত্নবিজ্ঞানী ড.এম. আর. মুঘলই এই মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদী ও সভ্যতার প্রকৃত আবিষ্কারক।* ১৯৭৪–৭৭ সালের মধ্যে সরকারিভাবে তাঁরই নেতৃত্বে ৩০০ মাইল দীর্ঘ ও কমবেশী ১০ থেকে ১৫ মাইল প্রস্থে হাকরা নদীর গতিপথের অনুসন্ধান চালান হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে নাসা (NASA) ও ইসরোর (ISRO) চিত্রাবলী থেকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় সরস্বতী নদী প্রস্থে ছিল ১৪ কি. মি. (সর্বশেষ প্রমাণ অনুসারে ২২ কি.মি.)**। সুতরাং বলশালী নদীরূপে ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীর যে তথ্য পাওয়া যায় তা প্রমাণিত এবং বৈজ্ঞানিক সত্য।

ভারত সীমান্তের শেষ থেকে পাকিস্তানের মরুভূমিতে অনুসন্ধান শুরু করে দেখা গেল যে দেরাওয়ার এবং তার দক্ষিণ-পশ্চিমে সভ্যতাস্থানগুলি খুবই কেন্দ্রীভূত। সুতরাং হাকরা সভ্যতার বিকাশের স্তরগুলি বুঝতে দেরাওয়ারের গুরুত্ব অসাধারণ। সরস্বতী তথা হাকরা নদীর ৩০০ মাইলের অনুসন্ধানে তখন পর্যন্ত ৪০৪টি সভ্যতাস্থান সনাক্ত করা হয়। চোলিস্তান মরুভূমিতে সভ্যতাস্থানগুলি ও সরস্বতীর গতিপথের মানচিত্র বর্তমানে তৈরি হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক সরস্বতী নদীর 'প্রাকৃতিক সমতুল' ('physical equivalent') অনুসারে। সরস্বতী সভ্যতার সংগৃহীত নিদর্শনগুলির সময় নির্ধারণ হয়েছে কার্বণ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে।

চোলিস্তান মরুভূমিতে সরস্বতী সভ্যতা (৬০০০–৩০০০ বছর প্রাচীন)

সরস্বতী নদীর উভয় উপকূলেই ছিল সভ্যতা। ড.মুঘল এই সরস্বতী/হাকরা

---

* M.R. Mughal, 'The Recent Archaeological Research in the Cholistan Desert'.

**N.S. Rajaram, 'Sarasvati : River and Civilization' : 469;

সভ্যতার একটি স্মারণী তৈরি করেছেন আমাদের জন্যে।

হাকরা/সরস্বতী সভ্যতা স্মারণী

প্রায় কাছাকাছি সময়কাল	সাংস্কৃতিক অনুসঙ্গ ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন	সভ্যতা স্থানের সংখ্যা
(১) বর্তমান থেকে ৬ষ্ঠ সহস্রাব্দ বছর প্রাচীন	হাকরা মাটির বাসন, পণ্যদ্রব্য (Hakra Ware)	৯৯
(২) বিগত ৫ম সহস্রাব্দ প্রারম্ভ কাল	হরপ্পা সভ্যতার প্রারম্ভে যে সব জিনিস আবিষ্কার হয়েছে সেই সবই এই সভ্যতায় ছিল	৪০
(৩) বিগত ৫ম সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময় থেকে শেষ সময়	উন্নততম হরপ্পা সময়কালে যে সমস্ত সভ্যতা নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে এই সময়কালে সরস্বতী উপকূলেও সেইসব নির্দশন আবিষ্কার হয়েছে	১৭৪
(৪) বিগত ৪র্থ সহস্রাব্দের প্রারম্ভ থেকে পরবর্তী সময় কাল	হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়ে যে সব নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে সেই সবই এখানে পাওয়া গেছে	৫০
(৫) বিগত ৪র্থ সহস্রাব্দের শেষ থেকে ৩য় সহস্রাব্দের প্রারম্ভ সময়কাল	হরপ্পা সভ্যতা শেষ হলে যে যে অহরপ্পীয় আঞ্চলিক সভ্যতা উদ্ভবের নিদর্শন মিলেছে সেইসব এখানে পাওয়া গেছে	১৪

(১) বিগত ৬ষ্ঠ সহস্রাব্দে সরস্বতী সভ্যতা ঃ

পাকিস্তানে সরস্বতী সভ্যতার নাম হাকরা সভ্যতা কারণ হাকরা নামক স্থানে প্রথম এ সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্নবিজ্ঞানের আলোতে দেখা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক কালে সরস্বতীর উপকূলে মানুষের বসতির ধাঁচটি ছিল 'অত্যধিক পরিমাণে শান্ত'... ('The protohistoric settlement pattern in Cholistan has largely remained undisturbed' ... Dr. Mughal :

108)। এইরূপ অস্থিরতাহীন পরিবেশ সৃজনশীল কাজের পক্ষে অনুকূল মনে করা যেতে পারে। আবিষ্কৃত বসতি স্থানগুলি ছিল নদী উপকূলে উঁচু জায়গায় সমতল এলাকায়। সরস্বতী নদীকে ভিত্তি করে এখানে সেই সময়কালে এক স্থানীয় সভ্যতা শুরু হয়েছিল। এখানে তৈরি মাটির বাসনগুলি খুবই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেই সময়ের মাটির পাত্র ও বাসন হাত দিয়ে আথবা চাকা ঘুরিয়ে তৈরি করা। পাত্রগুলি সুন্দর করতে বাসনেরই ছোট ছোট ভাঙ্গা টুকরো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে লেপা হত পাত্রের উপরের দিকে। আবার পাত্রের গায়ে আনুক্রমিক দাগ কেটে কেটে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হত। হাতে তৈরি করা পাত্র মোটা, চাকাঘুরিয়ে তৈরি করা পাত্রগুলির পাতলা চাদর। পাত্রের গায়ে বসান হত খুব লাল বা চকলেট রঙের ছোট টুকরা। লাল রঙের পাত্রের গায়ে কাল রঙের টুকরো ('slip') বসান হত। টুকরোগুলি পালিশ করে উজ্জ্বল করা হত। সরস্বতী সভ্যতার মানুষ যে সময়কালে সুন্দর পালিশকরা উজ্জ্বল মৃৎপাত্র তৈরি করে ব্যবহার করত তেমন সুন্দর চকচকে পাত্র ৬ষ্ঠ সহস্রাব্দে সিন্ধু সভ্যতার কোন স্থানেই এখনও পাওয়া যায়নি।* **গেরুয়া রঙের** পাত্রের ব্যবহার কম হলেও ৬০০০ বছর প্রাচীন সময়কাল থেকে ভারতে যে তার ব্যবহার ছিল সে প্রমাণ আছে। ('The Hakra Wares assemblage also includes a small percentage of distinctive buff wares'–ibid.)। তবে সবুজ রঙের ব্যবহার যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৬ষ্ঠ সহস্রাব্দ সময়কালের **গরু ও ষাঁড়ের মূর্ত্তি** সরস্বতী সভ্যতা থেকে পাওয়া গেছে (...'other finds of the period include animal figurines with short joined legs including those of bulls and cows'...ibid.)। আরও পাওয়া গেছে কচ্ছপের শক্ত খোলা, পোড়ামাটির হাতের বালা, (শস্য) গুঁড়ো করার পাথরের টুকরা। দুদিকে ধারাল ছোট-বড় ছুরি, তীরের মাথা, ঘসার পাথর ইত্যাদি। এইসব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে দেরাওয়ার ফোর্টের চারপাশের বহু স্থান থেকে, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব দিকের কিছু স্থান থেকেও। দেরাওয়ারেতে পুরাতত্ত্বের স্থানগুলি ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল।

এখানে সর্বাধিক পরিমাণ স্থানে বসতি একই সময়কালে ঘটেছিল ['Most of the sites are single period settlements'... (ibid.)]। পরবর্তী সময়কালে অল্প কিছু স্থানে বসতি হয়েছিল। ৯৯টি স্থানের ৫২.৫% ছিল অস্থায়ী

* 'Material comparable to this Hakra black-slipped or burnished pottery is not yet known in the Greater Indus Valley at fourth millennium B.C.'–Mughal : 115.)

ছাউনি (camp sites), ৪৫.৪% বসতি এবং ২% বসতি এলাকার ভিতরে ইটভাটা ছিল (ibid)। প্রত্নবিজ্ঞানী এস.পি. গুপ্তের মতে, সরস্বতী ও রভি নদীর উপত্যকায় সভ্যতার উৎপত্তি বালুচিস্তানের লোকের দ্বারা হয়নি [(...'the beginning of civilization in the Saraswati and the Ravi basin was not the product of the efforts of Baluchi highlanders'...(Gupta : 50)]।

(২) বিগত ৫ম সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে সরস্বতী সভ্যতা ঃ

প্রথমেই বলা দরকার যে সরস্বতী সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতারই অঙ্গীভূত হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। এই সময়কালে কোট দিজি স্থান থেকে যে রকমের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সরস্বতী (হাকরা) সভ্যতার ৪০টি স্থান থেকেও মূলগতভাবে সেই একই রকমের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যদিও সেগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা ছিল। পাত্রগুলি সাধারণত চাকা ঘুরিয়ে তৈরি, ওজনে হাল্কা, পেট মোটা এবং কারুকার্য করা।

এইসব বাসন-পাত্রের সময়কাল ৫ম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে ছিল। এখানে সভ্যতা বিকাশে এক ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। মানুষের সংস্কৃতিই নগরায়ণের সূচনা করেছিল এবং নগরায়ণ অগ্রগতির দিকেই এগিয়ে চলেছে ('It is during the Early Harappan period that cultural process leading to full urbanization began'. (Mughal : 116)। প্রত্নবিজ্ঞানীরা সরস্বতী সভ্যতার ধারাবাহিকতা বারবারই উল্লেখ করেছেন।

১ম সময়কালে সরস্বতী তথা হাকরা মৃৎপাত্রের যুগের তুলনায় ২য় সময়কালে অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার প্রথমভাগে সভ্যতা স্থানগুলির আয়তন যেমন বাড়তে থাকে তেমনি কার্যকারণের জন্য উপযুক্ত সুসংবদ্ধ স্থানের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কমতে থাকে অস্থায়ী বাসস্থান বা ছাউনি (camp sites)—৫২.৫% থেকে কমে ৭.৫% হয়ে গেল। অর্থাৎ প্রায় সব মানুষ স্থায়ীভাবে সরস্বতী উপকূলে বাস করতে চাইল এবং বাস করা শুরু করে দিল। বহুমুখী কর্মভিত্তিক বসতির অনুপাত বেড়ে ৩৫% হল। ঘরে বসে কাজ, বিশেষ বিশেষ রকমের কাজ, হস্তশিল্পের কাজ বাড়তে থাকে। সরস্বতী উপকূলে চোলিস্তানে হরপ্পা সভ্যতা শুরু হলে সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে এইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

বসতি স্থানের আয়তনও বেশ বড়ই হয়ে গেল। ২৭.৩ হেক্টর* এলাকায় বিস্তৃত

---

১ হেক্টর = ২.৪৭১ বিঘা।

হল গমনওয়ালা বসতি এবং ২৫.৫ হেক্টরে বিস্তৃত হয়েছিল জলওয়ালি স্থানটিতে বসতি। গমনওয়ালা সরস্বতী তীরে প্রাথমিক হরপ্পা সভ্যতার বৃহত্তম বসতি স্থান... 'নিশ্চিত ভাবে শহর যদি নাও হয়, গমনওয়ালা ক্ষুদ্র নগর ছিল না। সুতরাং সরস্বতী উপকূলে প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতা সময়কালে ব্যাপক, বিস্তৃত বসতি ছিল—বড় নগর যদি নাও হয়, ছোটছোট বসতির মধ্যে নগরের উৎপত্তি হয়েছিল ('Gamanwala... was certainly not a small town... during early Harappan Period, large settlements–towns, if not large cities–emerged amidst a cluster of smaller settlements.'–Mughal : 117)। সরস্বতী সভ্যতার এখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মূল সাংস্কৃতিক ধাঁচ বিশেষভাবে চোলিস্তানে যা ছিল, ব্যাপকভাবে তাই অক্ষত ছিল (...'original cultural pattern especially in Cholistan, have remained largely intact.'–ibid.)। এই মূল সংস্কৃতি প্রাচীন সরস্বতী সভ্যতা সময়কালের কোন কোন স্থানে যেমন ছিল তাই কালিবঙ্গা, বানয়ালি এবং প্রাচীন চৌটাং নদীর দুই তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সরস্বতীর প্রাচীন সংস্কৃতিরই (৬০০০ বছরের) বিস্তার ঘটেছিল।

(৩) সরস্বতী উপকূলে উন্নত হরপ্পা সভ্যতা (৪৭০০ বছর প্রাচীন)

মরুভূমিতে আবিষ্কার হয়েছে ১৭৪ টি স্থানে (তখন পর্যন্ত) সরস্বতী নগর-সভ্যতা। এই সময়ে বসতি সাধারণভাবে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে সরতে থাকে। বসতি স্থানের সংখ্যা ও আয়তন বাড়তে থাকে। এখানে গণউরিওয়ালা নগরটির বিস্তার মহেঞ্জো-দড়োর মত ছিল (৮১.৫ হেক্টর*), শিল্পভিত্তিক স্থানের সংখ্যা প্রচুর বাড়ে এবং বসতি ও শিল্প এলাকার মধ্যে পরিষ্কার পৃথকিকরণ হয়ে যায়। এই সময়ে কাদার কাজ, কাঁচা মাটির বাসন ও মাটির মূর্তি আগুনে পোড়ানোর কাজ, বাসনপাত্রে রঙ করার কাজ প্রভৃতি হাতের কাজের স্থানগুলিও আলাদা হয়ে যায়। বর্তমান রাজস্থানের ঝুনঝুন জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের তামার ছাঁচ পাওয়া গেছে সিদ্ধু থর স্থান থেকে। সেখানে ইটের ভাটাও ছিল। এই সময়ে সামাজিক স্তর বিন্যাস ঘটল। পণ্যদ্রব্যের গুণমান অক্ষুন্ন রাখতে কাজের অতি বিশেষিকরণ হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বিনিময় বা বাণিজ্যের প্রচলন হল। হরপ্পা সভ্যতা যখন নগর সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছিল সেই সময়েই সিন্ধুর কেন্দ্রভূমি থেকে এ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল বালুচি পাহাড়ের পাদদেশে এবং আরব সাগরের উপকূলে। এর ফলেই শুরু দূরবর্তী সমুদ্র বাণিজ্য বা বিনিময় (Mughal : 118)।

(৪) সরস্বতী তথা হরপ্পা সভ্যতার শেষ সময়কাল (৪র্থ সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী)

এই সময়কালে সম্ভবত অতি ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, সিন্ধু উপত্যকায় জলের লেভেল নিচে নাবতে থাকায় বিপদ দেখা দেয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ বাড়তে থাকে এবং অনুপ্রবেশকারিদের দ্বারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় (Ibid : 119)। বর্তমান ভারতে যেন এরকমই চলছে। এই সকল ঘটনার ফলে হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃত এলাকায়—গুজরাটের লোথাল থেকে বালুচিস্তানের নোশারোতে—যে অভিন্ন লিপি, ভাষা, মূর্ত্তি, ওজন, ইটের মাপ প্রভৃতির—এক অভিন্ন সভ্যতা ছিল তা ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকল। পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করলেও প্রত্নবিজ্ঞানীরা কিছু কিছু নতুন স্থানীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব দেখতে পেলেন। যেমন সিন্ধুতে ঝুকার, পাঞ্জাবে কবর, গুজরাটে পরবর্তী 'অহরপ্পীয়' সংস্কৃতি। তখন অদৃশ্য হয়েছিল হরপ্পা সিল, 'মাতৃদেবী মূর্ত্তি' তৈরি, হরপ্পা লিপি ইত্যাদি। মাটির পাত্র তৈরিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই দেখা দিল। এই সব নতুন নিদর্শন পূর্বদিকে পাঞ্জাবে ও যমুনার পূর্বদিকে পাওয়া গেল। অর্থাৎ ৪০০০ বছর সময়কালে সরস্বতীর উপকূল থেকে পূর্বদিকে কিছু মানুষের চলে যাওয়ার নিদর্শন পাওয়া গেল। আফগানিস্তানের সিইস্তানে হেলম্যান্ড নদীর মত সরস্বতী নদীও নিজের মধ্যে 'ব'দ্বীপ তৈরি করেছিল দেরাওয়ারে। সেখানে কিছু সভ্যতা রইল। সরস্বতী উপকূলের বসতিস্থান কমতে থাকল। অস্থায়ী ক্যাম্প স্থানে মানুষের থাকা বেড়ে ২৬% হল যা উন্নত সরস্বতী সভ্যতার সময়ে ছিল মাত্র ৭.৫%।

সরস্বতী সভ্যতার শেষ সময়কালে পাওয়া গেল মাটির সুন্দর সুন্দর লাল রঙ্ করা পাত্র যার উপর চকচকে উজ্জ্বল কাল রঙের ভাঙ্গা বাসনের টুকরো বসান থাকত। এই রকমের নকশা করা বাসন এখনও প্রচলিত আছে।

(৫) হরপ্পা পরবর্তী সময়কাল ঃ

উত্তর-পূর্বদিকে চোলিস্তানের ১৪টি স্থান থেকে রঙকরা ধূসর বর্ণের মাটির পাত্র আবিষ্কারের কারণে মনে করা হয় যে বসতির বিস্তার সেদিকে গিয়েছে। ভারতে এই রকম নতুন সাংস্কৃতিক স্থানের সংখ্যা ৩২০টি (ibid:120) যেগুলি রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর-প্রদেশে। প্রত্নবিজ্ঞানী ড. লালের মতে এইগুলির সময়কাল খৃঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দের শেষ বা ১ম সহস্রাব্দের প্রথমে। মনে করা যেতে পারে ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে বসতি সরে আসছিল সরস্বতী উপকূল থেকে।

উপসংহারে ড.মুঘল বলেন যে চোলিস্তানের হাকরা নদী পুনঃপুনঃ সনাক্ত হয়েছে সরস্বতী নদীরূপে। খৃ.পূ. ৪র্থ সহস্রাব্দ বা ৩য় সহস্রাব্দের প্রারম্ভে হাকরা (সরস্বতী) ছিল তার সমস্ত গতিপথে এক চিরজীবী নদী। 'খৃ.পূ. ২য় সহস্রাব্দের প্রায় শেষে অথবা ১ম সহস্রাব্দ শুরুর পরে নয়—এই সময় থেকে হাকরা নদী সম্পূর্ণ গতিপথে বোধ হয় শুকিয়ে গিয়েছিল এবং বর্তমান চোলিস্তান মরুভূমির যে আবহাওয়া তা শুরু হয়েছিল' (Mughal : 122)। হিমালয়ের হিমবাহগুলির জলধারাই ছিল সরস্বতী নদীর জলের উৎস। প্রাকৃতিক কারণে সেই জলের উৎস বন্ধ হয়েছিল। তার ফলে সরস্বতী নদীর বিনাশ হল। থর মরুভূমি চোলিস্তানকে গ্রাস করল। মরুভূমির আবহাওয়ার জন্যে মানুষ সরস্বতী উপত্যকা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। হাকরা নদীর উপরিভাগে বর্ষার জলের সামান্য যোগান যেখানে ছিল সেখানে 'ধূসর রঙের মৃৎপাত্র' ('Grey Ware') তৈরিকারী কিছু মানুষ ছিল। বর্ষার সামান্য জলে অপুষ্ট শীর্ণ বর্তমানের এই সরস্বতী নদীকে দেখে গ্রীফিত সাহেব ভুলবশত বললেন যে এই নদী কখনই ঋগ্বেদে বর্ণিত সেই বলশালী সরস্বতী নদী হতেই পারে না। ...'বোধ হয় সম্ভবত সিন্ধু বা ইন্ডাসই সরস্বতীর অপর নাম'।*

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এবং ফৈজ হাবিব বললেন যে সরস্বতী তিনটি ছিল ঃ (১) আফগানিস্তানের হেলম্যান্ড, (২) সিন্ধু এবং (৩) বর্তমানে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের মধ্যে প্রবাহিত। প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানী বি.বি. লাল মন্তব্য করেছেন যে 'হাবিবেরা অন্ধভাবে গ্রীফিতের অনুবাদ অনুসরণ করেছেন' ('Habibs have blindly followed Griffith's translation'... Lal : 260)।

সরস্বতী নদী আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা যিনি বাবরি মসজিদের পক্ষ অবলম্বনকারিদের মধ্যে ছিলেন প্রধান ব্যক্তি তাঁর মত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত। তিনি লিখেছেন, 'সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে মৌলবাদীরা সরস্বতীর শ্রেষ্ঠত্ব সিন্ধুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। হরপ্পার প্রেক্ষিতে তারা মনে করেছে যে (দেশ) বিভাগের পরে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়েছে সিন্ধু একমাত্র সরস্বতী হিন্দুদের অধিকারে থাকছে।' তিনি আরও বললেন যে প্রারম্ভে বৈদিক সরস্বতীই হরকাবতী বা হেলম্যান্ড। যেমন বৈদিক লোকের (আর্যদের) বিস্তার হল সরস্বতী নাম পাঞ্জাব, হরিয়ানা...প্রয়াগ ও রাজগিরে তারাই নিয়ে গেল'।

ডি. ডি. কোশাম্বী যেমন সিন্ধু সভ্যতাকে 'বর্ব্বরতা' বলেছিলেন শর্মা কিন্তু সরস্বতী সভ্যতাকে বর্ব্বরতা বলেননি যদিও তিনি হিন্দুদের যারা গঙ্গা, সিন্ধু,

*'2.*She* : Sarasvati as the river. The description given in the text can hardly apply to the small stream generally known under that name; and from this and other passages which will be noticed as they occur it seems probable that Sarasvati is also another name of Sindhu or the Indus.'–tr. Griffith, *Regveda*, Foot-note, p. 323).

সরস্বতীর কল্যাণময়ী ভূমিকার জন্য মায়ের মত মনে ভাবে তাদের বললেন 'মৌলবাদী' ও 'সাম্প্রদায়িক'। হাবিবদের ও ড. শর্মার মতকে প্রত্নবিজ্ঞানী ড.লাল 'ভ্রান্ত মত' বলেছেন (Lal, p. 258 : 'Some Erroneous Views')।

আমরা ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করেছি যাঁরা নদী ও মানব সভ্যতা গবেষণায় বিশেষজ্ঞ। সরস্বতী সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যা লেখা আছে তা ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী ড.পুরি ও ড. ভার্মা এবং প্রত্নবিজ্ঞানী ড.মুঘল, ড.লাল, ড.গুপ্ত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হবে ততই মতবাদিক অনুমানের অন্ধকার থেকে আলোতে পৌঁছান সম্ভব হবে। ততই ভ্রান্ত মতবাদ, ভারতবাসী বিশেষত হিন্দুবিরোধী অন্ধ কুসংস্কার দূর হবে। মন্দিরের উপরেই বা সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণের দ্বারা মন্দির, তীর্থস্থান তথা হিন্দুধর্ম বিলোপের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের দ্বারা মসজিদের তলা থেকে মন্দিরের প্রত্ন নিদর্শণ প্রমাণ হিসাবে আবিষ্কারের ফলে। অযোধ্যার মত পাঞ্জাবের মুলতানে সূর্যমন্দিরের উপরেই একটি মসজিদ তৈরি করে সেখানে ধর্ম বিলোপ করা হয়েছিল। আল্ বেরুনী লিখেছেন, 'মহম্মদ কাসিম মুলতান জয় করে সূর্যমন্দিরের দেবতাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে দেবমূর্ত্তির গলায় গো-মাংস ঝুলিয়ে দিলেন এবং সেই জায়গার উপরেই একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। (Al-Biruni, *INDIA*, NBTI, p. 53)। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে এখন পর্যন্ত ১০৭৪টি সরস্বতী সভ্যতার স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চোলিস্তানের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু প্রাক্-মরুভূমি সময়কালে সৃষ্ট প্রাচীন ভারতের সরস্বতী সভ্যতার সেই 'আদি রঙীন পাথরের বসতি নমুনা রয়েছে ভালভাবেই সুরক্ষিত' (Mughal : 122)।

হরপ্পা সভ্যতায় আবিষ্কৃত হিন্দুধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

(১) বিখ্যাত মাতৃদেবী (Mother Goddess)

নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের স্তর থেকে ব্যাগহরে বেদীর উপর মাতৃঅঙ্গের পাথর এবং মেহেরগড় থেকে পোড়ামাটির বহু মাতৃদেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়ো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক মাতৃদেবীর মূর্তি (Mother Goddess) পাওয়া গেছে।

ওপার্টের মতে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবাসী 'এক সর্বোচ্চ শক্তিতে' ('one supreme spirit') বিশ্বাস করত। তাঁর সঙ্গে যুক্ত ও স্বীকৃত, এমনকি

তাঁর থেকেও অধিকতর ক্ষমতাশালী দেবী বসুন্ধরা (Goddess of Eearth)। উভয়েই শুভ ও অশুভ শক্তির নিয়ন্তা, তাঁরা মানুষ ও পৃথিবীর দুষ্ট শক্তিকে দমন করেন (Marshall, v.1:48)।

সৌজন্যে—
ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম
কোলকাতা

হরপ্পা সভ্যতা যে মাতৃদেবী মূর্ত্তি সৃষ্টি করেছে তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বর্তমান ভারতে পূজিত মূর্ত্তির মিল লক্ষ্যণীয়। পোড়ামাটির ছোট ছোট খেলনা মূর্ত্তি বাদ দিয়ে হরপ্পা সভ্যতার নারী মূর্ত্তিগুলি দুই রূপের—কতগুলির শান্ত-সুন্দর রূপ, অন্যগুলির ভয়ঙ্কর রূপ। এই মূর্ত্তিগুলি দাঁড়ান। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির শিরোভূষণ। মোচা আকৃতির গাল, গলায় হার, কানে অলঙ্কার। ভয়ঙ্কর রূপের মূর্ত্তিগুলিকে জন মার্শাল ভয়ঙ্কর কালীমূর্ত্তির পূর্বরূপ মনে করেছেন (...‘the later type is clearly intended to inspire horror... hardly fail to remind us of the malignant Kali... these figurines may be taken to be early prototype.’ –Marshall : 50) । সুতরাং সম্ভবত মা কালীর উদ্ভবও করেছে হরপ্পা সভ্যতা। শাক্ত সম্প্রদায়ের দেবীর উৎপত্তি হরপ্পা সভ্যতা থেকে বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিন্ধু সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত নারী মূর্ত্তির মত একই রকমের বহু নারীমূর্ত্তি পশ্চিম এশিয়ার পারস্য থেকে ইজিপ্ট পর্যন্ত দেশগুলিতে পাওয়া গেছে এবং সকলে স্বীকার করেছেন যে এই নারীমূর্ত্তিগুলি মাতা বা প্রকৃতি দেবী। সিন্ধু সভ্যতা ও পশ্চিম এশিয়া থেকে পাওয়া নারী মূর্ত্তির মধ্যে মিল এমনই যে সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত নারী মূর্ত্তিগুলিকে মাতা বা প্রকৃতি দেবী হিসাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Marshall : 50)। পশ্চিম এশিয়ার উদাহরণ ছাড়াও বড় কথা হল মহেঞ্জো-দড়ো, হরপ্পা ও বালুচিস্তানের এই নারীমূর্ত্তিগুলি মাতৃমূর্ত্তির বা স্থানীয় দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। কারণ পৃথিবীতে আর অন্যকোন দেশ নেই যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের মত পবিত্র মাতৃপূজার শিকর এত গভীরে প্রবেশ করেছে এবং সর্বব্যাপিত্ব লাভ করেছে (‘For in no country in the world has the

worship of the Divine Mother been from time immemorial so deep-rooted and ubiquitous as in India.'–Marshall : 51)। সেমেটিক ধর্মাবলম্বীদের গ্রাম ছাড়া আজও ভারতের সমস্ত গ্রামে, নগরে, শহরে মাতৃপূজার মন্দির/বেদী/থান আছে। তিনি দেবী, মাতৃমূর্ত্তি প্রকৃতির প্রতীক, সৃষ্টির প্রতীক, সন্তান পালনের ও রক্ষার প্রতীক। তিনিই শক্তি যিনি দুষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের মন্দিরে যেমন পরিবারেও তেমনি তিনি তাঁর শক্তিতে পরিবারকে রক্ষা করেন। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে যে শক্তি রক্ষা করছে তা মাতৃশক্তি। পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা ভারতের পরিবারে মাতৃশক্তি অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল বলেই পরিবার, সমাজ ও ধর্ম অনেক বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ সত্ত্বেও রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। প্রতি পরিবারে মা প্রত্যক্ষ মাতৃশক্তি। কোন অজানা কাল থেকে যে মাতৃপূজা শুরু হয়েছিল তা বলা অসম্ভব। মাতৃশক্তির প্রতীক যে বহু রকমের এবং পূজার রীতিও যে বহু বিচিত্র তাতে সন্দেহ নাই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা অনুসারে মাতৃমূর্ত্তিও ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়েছে। বিভিন্ন যুগে মায়ের ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন।

ঋগ্বেদের ঋষির কাছে 'পৃথিবী আমার মাতা' (ঋ১/১৬৪/৩৩)। আবার দেশকেও মা বলা হয়। ভরত থেকে ভারত শব্দের উৎপত্তি। 'ভৃ' ধাতু থেকে ভরত শব্দ, অর্থ পোষণ বা প্রদান করা। ভারত আমাদের অন্নজলে পোষণ করে। তাই ভারত আমাদের মাতা (ঋ, টীকা নং ২৪, হরফ, খ ১., পৃ. ২২৫)। বিদেশীরা ভারতবর্ষকে ভোগ করে। ভারতবাসীর কাছে ভারত 'ভারতমাতা'।

অনেকে মনে করেন যে সন্তান সৃষ্টি ও লালন-পালন করেন মা। তাঁর এই ভূমিকা থেকেই 'মাতৃদেবী ও মাতৃপূজার' উৎপত্তি। কিন্তু দেখা যায় যে সব দেশেই মা আছেন কিন্তু ব্যাপক মাতৃদেবী ও মাতৃপূজা ভারতের মত সব দেশে নেই।

মাতৃ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ভারতের অনেক সাধক অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছেন। সেই ক্ষমতাবলে শিষ্য তৈরি করে ভারতের ধর্মসংস্কৃতি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে স্বল্পায়ু স্বামী বিবেকানন্দের পর্বতপ্রমাণ কর্মযজ্ঞ একটি উদাহরণ হতে পারে।

যে মাতৃশক্তি অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল তা এখন দুর্বল থেকে দুর্বলতর। দুষ্টচক্র মাতৃজাতিকে ভোগ্যবস্তুর মত প্রচার চালিয়ে বিভ্রান্ত করছে। শুধু সন্তান নয়, সুসন্তানের জন্ম দিতে, সংসারকে সুখের করতে, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করতে মাতৃশক্তির উত্থান বর্তমানে খুব বেশী জরুরী।

(২) যোগী-পশুপতি-শিব

মহেঞ্জো-দড়োতে আবিষ্কৃত ২টি ভাল সিলে (৩টির মধ্যে) একজন যোগীর ছবি। একটিতে যোগীর তিনটি মুখ অপরটিতে মুখ একটি। যোগী যোগাসনে

স্যার জন মার্শালের সৌজন্যে

বেদীর উপরে সোজা বসে আছেন। এই আসনটির নাম মূল বন্ধ্যাসন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ধ্যানস্থ যোগীর মতই নাকের ডগায় নিবদ্ধ। ভাজ করা হাঁটুর উপরে লম্বা টানটান দু-হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল। দু-হাতের বালা প্রায় সমস্ত হাতই ঢেকে রেখেছে। গলায় হার/সাপ, কোমরে কোমর-বন্ধনী যার নিচে যেন খাঁড়া লিঙ্গ ('sithyphallic'–Chakraborti : 189; Marshall : 51) মাথার মুকুটের সঙ্গে দুটি বড় বাঁকা শিং (সম্ভবত ষাঁড়ের)। যোগীর ডাইনে হাতি ও বাঘ, বাঁয়ে গন্ডার ও মহিষ। যে বেদীতে তিনি বসে আছেন সেই বেদীতে সামনে নিচে দুটি হরিণ।

এই বেদীতে যিনি তিনি বসে আছেন বন্য হিংস্র প্রাণীর মাঝখানে যোগাসনে তিনি সাধারণ মানুষ নয়। তিনি যে যোগী তাতে দ্বিমত নেই। 'যোগ' থেকে 'যোগী'। যোগ হল ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ধ্যান ('attainment of union (*Yoga*) with god by mental discipline and concentration'– Marshall : 54)। চোখের দৃষ্টি অনুসারে তিনি গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন। আমরা জানি শিব মহাতপ, মহাযোগী। সুতরাং এই যোগী শিব হতে পারেন আবার পশুপরিবৃত হয়ে আছেন বলে পশুপতিও হতে পারেন।

দুটি সিলের একটিতে দেবতার মুখ তিনটি অপরটিতে একটি। এক মুখ এক চরম শক্তির প্রতীক (One absolute) আর তিন মুখ সৃষ্টি (ব্রহ্মা), স্থিতি (বিষ্ণু) ও প্রলয়ের (মহেশ্বরের) প্রতীক বলে কথিত আছে। অর্থাৎ তিন একরূপে আবার একই তিনরূপে। সুতরাং এই দুটি সিলের ছবি শিব হতেই পারেন। শিবেরই এক মুখ, তিন মুখ এবং পাঁচ মুখ (পঞ্চানন) হয়। কোমরবন্ধনীর ভিতর যদি 'উত্থিত

লিঙ্গ' হয় তবে উত্থিত লিঙ্গ শিবেরই বৈশিষ্ট্য।

যোগীর মুকুটে শিং। শিং পবিত্রতা ও দেবত্বের চিহ্ন (emblem of deity)। সমকালীন সুমের ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় দেবতা বুঝাতে শিংয়ের ব্যবহার ছিল (ibid)। ভারতে পরবর্তী যুগে এই শিং-ই যে সম্ভবত ত্রিশুলে পরিণত হয়েছে জন মার্শালের সেই অভিমত। বর্তমানে শিবের মূর্ত্তির সঙ্গে ত্রিশুল সব সময়েই দেখা যায়।

এই বেদীতে যেমন হরিণ আছে, তেমনই দেখা যায় মধ্যযুগের শিবের মূর্ত্তির হাতে হরিণ শাবক। বুদ্ধের সিংহাসনের (ধর্মচক্র) সামনে আছে হরিণ। এই সিংহাসনে বসেই বুদ্ধ প্রথম উপদেশ দেন। মনে হয় এই হরপ্পার মহাযোগী পরবর্তী যুগকে প্রভাবিত করেছে। আরও উল্লেখ্য, শিবের প্রিয় ধুতরা ফুল-ফল (Cannabis : Chakraborti : 189) হরপ্পা যুগেরই গাছ।

শিবের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই যখন এই দুই সিলের ছবিতে আছে তখন এই যোগী শিব বা শিবের পূর্বরূপ পশুপতি ছাড়া আর কি হতে পারে? জন মার্শাল বলেছেন যে সিলে অঙ্কিত দেবতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঘোষণা করে যে ইনি 'ঐতিহাসিক শিবের পূর্ব রূপ' ('We have, then, on this seal a god whose distinguishing attributes proclaim him the prototype, in its most essential aspects, of the historic Siva'–Marshall. 55)।

পশুপতি বা শিব যে কেবল তৈরি করেই রাখা থাকত, পূজা হত না তা মনে হয় না। লিঙ্গ (সৃষ্টির প্রতীক) ও শালগ্রাম শিলা বর্তমানে দেখি পূজার জন্যই তৈরি হয়। নাগা সন্ন্যাসীরা যে মাটির মূর্ত্তির শিবের পূজা করেন তা ঐ হরপ্পা সিলে অঙ্কিত পশুপতি দেবতারই রূপ। মার্শালের মতে মহেঞ্জো-দড়োর মানুষ কেবল মানুষ বা প্রাণীর প্রতীকই তৈরি করতে শেখেনি তারা তাঁদের পূজাও করত ...'the people of Mohenjo-daro...were worshiping them'... (ibid. 56)।

(৩) গৌরীপীঠ (সৃষ্টিতত্ত্ব)

মাতৃদেবী, মাতৃ অঙ্গ এবং পশুপতি বা শিবের প্রত্ননিদর্শন আলোচনার পরে আমরা গৌরী ও শিবের সেই সৃষ্টি রূপের আলোচনা করব যে রূপে তাঁরা বর্তমান ভারতের সর্বত্র পূজিত। এরূপটি শিব ও শক্তি তথা পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বের মিলিতরূপের নিদর্শন 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ('The union of the male and female principles is typified, of course, in the combined *linga*

and *Yoni* which are characteristic of Saivite shrines'.)। এখানে মাতৃদেবী নারীশক্তিরূপে (female energy) প্রকাশিত, এই শক্তি প্রকৃতি—শাশ্বত সৃষ্টির প্রতীক যার মিলন পুরুষতত্ত্বে। এই মিলনে মা সৃষ্টিরূপে, মা জগৎমাতা—এইরূপে মা সমস্ত পুরুষদেবতার এমনকি শিবেরও সৃজনকারিণী এবং তিনি শিবেরও উপরে। আবার শিব হলেন মহাদেব। অন্যান্য সব দেবতার শক্তি শিবেরই। তেমনি গৌরীও মহাদেবী। সব দেবীর শক্তি তাঁরই। সব দেবীরা তাঁরই অংশ। শিব যেমন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটান মহাদেবী তেমনি সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন। তাঁর গর্ভ থেকে সকলের সৃষ্টি এবং সেখানে সকলের ফেরা। সব কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষার পিছনে সেই রহস্যময় শক্তি। শিবের মত তিনিও অলৌকিক রহস্যময় শক্তি দান করেন। এই শক্তিকে জানার যে সাধনা ভারতে তা অতি প্রাচীন। 'দ্বৈত যৌন একত্ব' হল একটি প্রতীক ('duality in unity') যা সৃষ্টির প্রতীক। নাম গৌরীপীঠ। ভারতের সর্বত্র এইরূপে শিব ও শক্তির পূজা হয়। এই রূপ শাক্ত ও শৈব সকলের পূজ্য। মহেঞ্জো-দড়োর সভ্যতায় এই শাশ্বত প্রতীকের আবিষ্কার। যেহেতু যৌন একত্বতা ও সৃষ্টি তত্ত্ব অবিচ্ছেদ্য সেই জন্যই পঞ্চ 'ম'কার এই সাধনায় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। শিব ও শক্তি যেমন মঙ্গলদায়ী তেমনি ভয়ঙ্কর। মাতৃদেবী মূর্ত্তির উভয় রূপই খননকার্যের ফলে আবিষ্কার হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বর্তমান ভারতে আদি সৃষ্টির উপাসক হিন্দুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। বর্তমান হিন্দু ধর্মবিমুখ।

স্যার জন মার্শালের সৌজন্যে

(৪) নটরাজ

হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কালিবঙ্গা থেকে নটরাজের মূর্ত্তি আবিষ্কার হয়েছে। নটরাজ ধ্বংস বা মৃত্যুর প্রতীক। ঋগ্বেদে নটরাজের নামের পরিবর্তে 'রুদ্র' নাম দেখি যিনি মৃত্যুর দেবতা (ঋঃ ১/১৪৪)। কালিবঙ্গা খননকার্যের অধিকর্তা বি. বি. লাল লিখেছেন, 'এই মূর্ত্তিটির অসামান্যতা হল এইটির শরীর কিছুটা বাঁকান এবং একটি পা উপরে তুলে উপরেই একপাশের দিকে থাকা, যেন নাচের ভঙ্গিতে রয়েছে। বিবেচনা করা হচ্ছে নটরাজেরই পূর্বরূপ যদিও মানে রাখা উচিত প্রকৃত নটরাজের প্রচলন অনেক কাল পরে ও দূর স্থানে' ('The other

figure also represents a male ... its uniqunness lies in its twisted body and one of its legs lifted and thrown sideways, as if in a dancing pose. It is thought to be prototype of Siva Nataraj (god Siva in a dancing pose), though ... remember that actual examples of Siva Nataraj are far removed in time and space (B.B. Lal, *The Earlist Civilization in South Asia* : 170)

(৫) মহাদেবের বাহন ষাঁড়

ষাঁড় ও শিব যেন অবিচ্ছেদ্য। হরপ্পা সভ্যতার সিলে বড় কুঁজ ও বড় বড় শিংয়ের ষাঁড় আছে। পশুপতির মাথার মুকুটে দুটি বড় শিং দেখা যায়। ষাঁড় সহ গোজাতির উপর দেবত্বের আরোপ দেখা যায়।

ভারতের ভূপ্রকৃতি গোজাতির পক্ষে যতটা অনুকূল, ঘোড়ার পক্ষে তা নয়। কৃষি, গোপালন ও কুটির শিল্পের উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার বছর ধরেই ভারতে এক প্রাণবন্ত সমাজ ছিল। তার প্রমাণ ভারতবাসীর কালজয়ী রচনা সম্ভার—বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি। স্বৈরাচারি দুর্যোধনদের উত্থান ও ধ্বংসের ঘটনা ছাড়া প্রাচীন ভারত যে সমাজ প্রবর্তন করেছিল তাই চলছে। ধর্ম, সমাজ কাঠামো, সমাজ নীতি অবৈজ্ঞানিক হলে ভারতের সমাজ ধ্বংস হত, সভ্যতার শুরু থেকে বিদেশী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই সভ্যতা চলত না। সোভিয়েত রাশিয়ার 'বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ' একশ বছরও টেকেনি। অথচ ভারতীয় সমাজ সগৌরবে চলেছে। সে যুগেই আমরা 'গুরুর আসনে' ছিলাম। সভ্যতা ও সমাজ গোজাতির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। গোজাতির এই ভূমিকার জন্যই সম্ভবত সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টারা গোজাতিকে দেবতার স্থানে বসিয়েছিলেন। দুটি সিল (Pl. CXVI, 5 & 6 এবং Pl.CXVIII, 9) ব্যাখ্যা করে মার্শাল সিদ্ধান্ত করেন যে এই সিলটিতে যে প্রাণী দুটি আছে তার একটি প্রাণীকে ভগবান বা তার প্রতিনিধিরূপে পূজা করা হত (Marshall : v. 3, p. 385)।

(৬) ঘরের মধ্যে ঠাকুর দেয়ালের কুলুঙ্গিতে

হিন্দুদের ঘরের মধ্যে ঠাকুরঘর থাকে। মার্শালের গ্রন্থে (*Mohenjo-Daro,* v.3, SD Area, PlXVII,a) দেখা যায় মহেঞ্জো-দড়োর একটি ঘরের কুলুঙ্গিতে প্রতিমা ('Imageniche')। ধবলিকারের মন্তব্যঃ 'হরপ্পার ধর্ম যেমন ব্যক্তিগত আজকের হিন্দু ধর্মও তেমনি।'

কুলুঙ্গিতে প্রতিমা (মার্শালের গ্রন্থে এ ছবি অস্পষ্ট)

(৭) হোম/যজ্ঞবেদী

কালিবঙ্গা, লোথাল ও সৌরাষ্ট্রে খনন কার্যের ফলে যজ্ঞবেদী ('fire alters') আবিষ্কার হয়েছে। কালিবঙ্গাতে ৪/৫টি অগ্নিপূজার বেদী পাওয়া গেছে। লোথালের
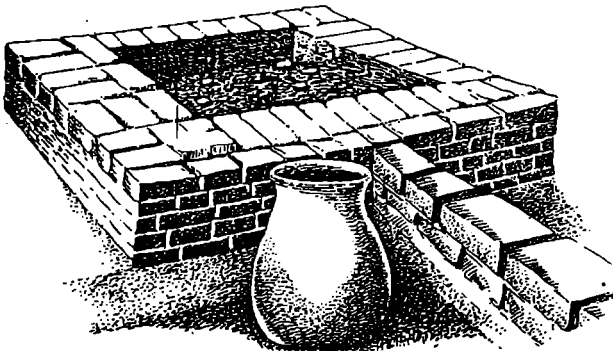
যজ্ঞবেদী (লোথাল) ধবলিকারের সৌজন্যে

বেদীগুলি গোল ও চৌকোনা। রোদে শুকানো বা আগুনে পোড়ান ইটের তৈরি বেদী। অগ্নিপূজার বেদী ঘরের মধ্যে যেমন পাওয়া গেছে রাস্তার ধারে বিরাট বেদীও আবিষ্কার হয়েছে। লোথালে ২.৭০ x ২.৪০ x ০.১৫ মি. মাপের যে বড় বেদী পাওয়া গেছে সেটি জনসাধারণের জন্য যজ্ঞ বেদী ('The structure served the purpose of fire alter where public could worship fire'.– Dhavalikar : 62)। কোন কোন যজ্ঞে প্রাণী উৎসর্গের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দু ধর্মে যজ্ঞ প্রচলিত। তারপর বৈদিক সভ্যতা। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটিই অগ্নিদেবকে স্তুতি করে ঃ 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।।' এখানে 'অগ্নি' ও 'যজ্ঞ' শব্দদুটি লক্ষ্যণীয়। ঋগ্বেদে অসংখ্যবার যজ্ঞ শব্দ আছে। এই ধর্মের ধারাবাহিকতাও লক্ষ্যণীয়। যুগ যুগ ধরে হিন্দু ধর্মের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয়। যজ্ঞ ও যজ্ঞবেদী হিন্দু ধর্মের অঙ্গ। ব্যাপকার্থে সমস্ত মঙ্গল কর্মকে যজ্ঞ বুঝায়।

(৮) ধুনুচি

হরপ্পা সভ্যতার রাজস্থানের কালিবঙ্গায় অনেকগুলি মাটির তৈরী সম্ভবত আগুন রাখার পাত্র আবিষ্কার হয়েছে। দেখতে ঠিক ধুনুচির মত। এগুলিকে ধুনুচি মনে করা যেতে পারে। বর্তমানে এইরকম হাতলের ধুনুচি হিন্দুরা আরতি পূজায় ব্যবহার করেন।
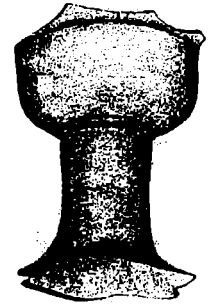
কালিবঙ্গা মিউজিয়াম, রাজস্থান (প্রতিরূপ)

(৯) মহেঞ্জো-দড়োর বিশ্ববিখ্যাত স্নানাগার

মহেঞ্জো-দড়োর বিরাট স্নানাগারটি পুণ্যস্নানের কাজে সম্ভবত ব্যবহার হতো বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। স্নানাগারের পাশে ছোট ছোট ঘর ছিল যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাজে সম্ভবত ব্যবহার হত। এই বিরাট স্নানাগারটির (১৮০' X১৮০') চারিদিকে ঘর ও গ্যালারি। স্নানাগার থেকে পুরান জল বার করে নতুন জল ঢোকানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্নবিজ্ঞানী পসীল এই স্নানাগারটিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্থান হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে 'ঢিবির উচুঁ স্থানটিকে পুণ্যস্থান রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিখ্যাত স্নানাগারের জল দৈহিক পবিত্রতার ও প্রতীকি পবিত্র জল হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে (..."the bath at Mohenjo-daro seem to have been a place of ritual... The elevation of the mound can be
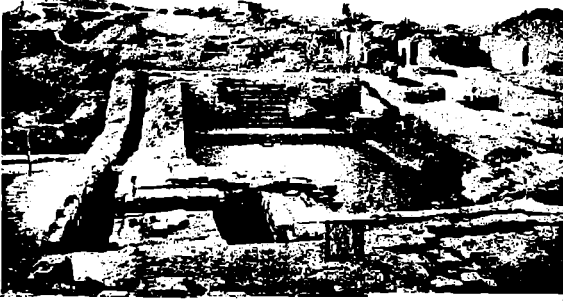
taken to mark this space symbolically auspicious. The water of the great Bath would then relate to cleanliness, probably both physical and symbolic' (Possehl, 'Transformation of Harappan Civilization' : 215)। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় স্নান সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতা-সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছে যা বর্তমানেও প্রচলিত।

(১০) স্বস্তিকা

স্যার জন মার্শালের গ্রন্থে বহু স্বস্তিক ছবির মধ্যে ১৬টি ভাল স্বস্তিক ছবি আছে। স্বস্তিক শুভ, মাঙ্গলিক, পবিত্র ও সৌভাগ্যের চিহ্ন। মঙ্গল গীত যারা গাইত
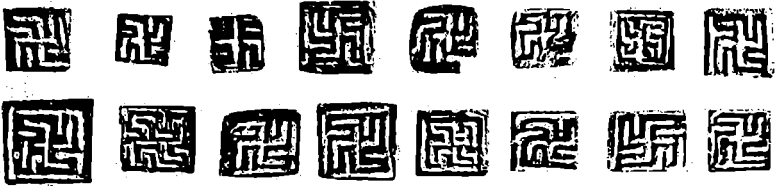
তাদেরও স্বস্তিক বলা হত। অনেক পণ্ডিতের মতে বিষ্ণুর চক্রের সংক্ষিপ্ত প্রতীক চিহ্ন স্বস্তিক। যযুর্বেদের পঞ্চ স্বস্তি মন্ত্রে (২৫/১৮-১৯) স্বস্তিক ব্যক্ত। জৈনদের ২৪টি শুভ চিহ্নের মধ্যে একটি স্বস্তিক। আধুনিক গবেষক রাজারাম ও ঝায়ের মতে স্বস্তিক অর্থ মঙ্গল করেন যিনি (*'Svasti-ka,* meaning maker of welfare'–Rajaram & Jha : 496)।

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে কিছু বুদ্ধিজীবী প্রচার চালাতেন যে হিন্দুর প্রতীক স্বস্তিক নাৎসী বা ফ্যাসিষ্ট হিটলারের থেকে নেওয়া। যেমন গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছিলেন, 'হিন্দুত্ববাদ ফ্যাসিবাদ, রক্ত বীজের ঝাড়... । ভারতের ধর্মসংস্কৃতিতে স্বস্তিক মঙ্গল চিহ্নটি হরপ্পা সভ্যতায় আবিষ্কৃত, যা বেদ, মহাকাব্য, পুরাণের পরে বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে রয়েছে।

(১১) শঙ্খ

অনেকগুলি শঙ্খ মহেঞ্জো-দড়োতে পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার মানুষ বাদ্য শঙ্খ ব্যবহার করতেন। শঙ্খ যুদ্ধে বাজানো হত। ঋগ্বেদের মন্ত্রে আছে ঃ 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সহিত শঙ্খে শব্দ কর'... (১/১১২/১)। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে শঙ্খ বাজানর কথা গীতায় আছে (১/১২/১৬)। বর্তমানের হিন্দুরা সন্ধ্যাবেলায় শঙ্খ বাজান। পূজায়, তর্পণে ও সবরকম শুভকর্মে শঙ্খ বাজান হয়। সেমেটিক ধর্মালম্বীদের মধ্যে শঙ্খ বাজানোর প্রচলন নেই। শঙ্খ বাজান ভারতে চলছে হাজার হাজার বছর ধরে।

(১২) ওঁ/ॐ

হিন্দু ধর্মে ওঁ প্রধান মন্ত্র। পণ্ডিতদের মতে এই অক্ষরটির আদিরূপ হরপ্পা সিলের ছবিতে রয়েছে (Rajaram and Jha : 496)। দুটি ছবির একটি যথাযথভাবে অপরটি ৯০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে দেখান। এই ছবিটি যেন দেবনাগরি অক্ষরে ওঁ। কানাডা ও তেলেগু ভাষার অক্ষরে 'ওঁ' হরপ্পা সিলের 'ওঁ' টিরই মত। সিলের ছবিটি যেন তীর ও ধনুক। মুণ্ডক উপনিষদ অনুসারে ধনুকটি হল 'প্রণব', তীর হল আত্মা এবং লক্ষ্য ব্রহ্ম। সম্পূর্ণ একাগ্রমনে তীররূপ আত্মা নিক্ষেপ করতে হবে ব্রহ্মে—ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে।

রাজারামের সৌজন্যে

সিলে আছে অশ্বত্থের শাখায় পাতা। ঋগ্বেদে (১০/৯৭/৫) অশ্বত্থের উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদে (২/৩/১) অশ্বত্থকে পবিত্রতার মূল বলা হয়েছে। গীতা অনুসারে 'তিনি যিনি ঐ অশ্বত্থ গাছকে জানেন যার মূল উপরে এবং শাখা নিচে, এবং যার পাতা বেদ, বলা হয় তিনি অমর'। পণ্ডিতদের মতে হরপ্পা সভ্যতার

স্রষ্টারা যে 'ওঁ' এর সৃষ্টি করেছেন বর্তমান হিন্দুদের কাছে তা খুবই পবিত্র মন্ত্র। অশ্বত্থও হিন্দুদের কাছে পবিত্র, বৃক্ষ দেবতারূপে পূজ্য।

ভবিষৎ ভাবনা ঃ

প্রস্তর যুগে পাথরের অস্ত্র দ্বারা পশু বধ করতে পেরে জঙ্গলের রাজত্বের অবসান ও মানুষের রাজত্বের সূচনা হয়। নদীর জন্যে ভারতের মানুষের সভ্যতা। বোলন, সিন্ধু-সরস্বতীর উর্বর পলিমাটি প্রস্তর যুগের মানুষকে কৃষিকর্মে সফল করে। কৃষির সাফল্যে স্থায়ী বসতি, ঘর-বাড়ী এবং মেহেরগড়ে সভ্যতার শুরু। পশুবধ করতে পেরে আত্মরক্ষার সুযোগ এবং কৃষি কার্যের ফলে খাদ্যের নিশ্চয়তা বাড়ল। সভ্যতার স্থায়ীত্ব হল।

ভরণ-পোষণ থেকেও বেশী সম্পদ দান করে নদী তার দুই কূলের প্রস্তর যুগের মানুষকে। বাড়তি সম্পদ দ্বারা জনপদ, রাজ্য, রাজত্ব, নগরায়ণ, নগরসভ্যতার সৃষ্টি সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি নদীর উপকূলে। কৃষিকাজে অবকাশ শিল্প ও অন্যান্য কাজের সুযোগ করে দেয়। নদীর মনোরম ও শান্ত পরিবেশের প্রভাব মানুষকে সুস্থ ভাবনা-চিন্তা করতে সক্ষম করে। এক উদ্ভাবনী ক্ষমতা তারা লাভ করে যার ফলে একমাত্র প্রাচীন ভারতেই সুপরিকল্পিত নগর সভ্যতা ও উন্নত শিল্প সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম সম্পদ ঋগ্বেদের সৃষ্টি সরস্বতী নদীর উপকূলে।

মেহেরগড়ের মানুষ সাত সহস্রাব্দ সময়কালে মাটির মূর্ত্তি তৈরি শুরু করেন। মূর্ত্তির বেদীর প্রতি তাদের বিশেষ যত্ন ছিল। নব্য প্রস্তর যুগে সোন নদীর উপকূলে ব্যাগহরে 'পবিত্র মাতৃঅঙ্গ বেদী' আবিষ্কার হয়েছে যে রকম বেদী সেখানের মানুষ আজও পূজা করেন। বেদী, মাতৃমূর্ত্তি, পশুপতি, গৌরীপীঠ, ঘরের মধ্যে ঠাকুরঘর, যজ্ঞবেদী এসবই হিন্দু ধর্মের নিদর্শন—আবিষ্কার হয়েছে নব্য প্রস্তর যুগের শেষে যখন সভ্যতা শুরু সেই সময় থেকে। বর্তমানে হিন্দু বলতে যাদের দেখি তাঁরাই এসবের পূজা করেন। হিন্দুরই ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় 'শঙ্খ' বাজে, পূজায় 'ধুনুচি' ও মঙ্গল চিহ্ন 'স্বস্তিক' তাঁরা ব্যবহার করেন। 'ওঁ' তাঁদেরই প্রধান মন্ত্র। মহেঞ্জো-দড়োর বিখ্যাত স্নানাগারে 'পুণ্য স্নান' হতো—প্রত্নবিজ্ঞানীরই অভিমত। সিলে অঙ্কিত পশুপতির সঙ্গে যেমন জীবজন্তু আছে তেমনি বর্তমান হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে আছে জীবজন্তু। প্রস্তর যুগ ত্যাগ করে ভারতের মানুষ যে ধর্ম-সংস্কৃতির জীবন শুরু করেছিল হিন্দুরা সেই ধর্মসংস্কৃতিরই ধারক। কেউ যদি প্রাচীন পৃথিবীর ধর্ম কি তা জানতে চায় তবে সে তা দেখতে পাবে এই হিন্দুর ধর্মের মধ্যে। বেদের শ্লোক অনেকেরই অজানা, কিন্তু বৈদিক ঋষির নামানুসারে হিন্দুর গোত্র। এই ধর্ম-সংস্কৃতির

ধারাবাহিকতা অনুসারে হিন্দুরাই ভারতের প্রাচীন মানুষের বংশধর।

এই প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সমাজ পুরুষতান্ত্রিক অথবা নারী তান্ত্রিক ছিল না বলেই মনে হয়। পুরুষ দেবতা (পশুপতি) ও নারী দেবীমূর্ত্তি উভয়ই আছে। মেহেরগড়ে নারী মূর্ত্তিই বেশী। নারীপুরুষের আকাঙ্ক্ষায় ও উভয়ের দ্বারা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি সৃষ্টি। নারীপুরুষ বহুজনের ভূমিকা ছিল। একজন পুরুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও আরোপিত ভারতীয় ধর্ম নয়।

কিন্তু আবিষ্কৃত হরপ্পা সভ্যতায় মোট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংখ্যার মধ্যে সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র, নরহত্যা, রাজা, রাজনীতিক নিদর্শন সংখ্যা এতই নগন্য যে অসামরিক ও অরাজনৈতিক এক সভ্যসমাজের চরিত্রের লক্ষণই সুস্পষ্ট। এই চরিত্র বর্তমানের হিন্দু সমাজেরই চরিত্র। এক ডাকে হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হয় না যেমন মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে সে কোন বাধা পায় নি—এক ঈশ্বরের নামে 'আল্লা হো আকবর' বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকি 'হিন্দু এসো' তখন কে আসবে।" (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিভা. ১২/৬৫৯)।

এর কারণ হিন্দুর ধর্ম জমায়েত হওয়া নয়, ব্যক্তিগত। এ ধর্মের উৎপত্তি প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিকে রক্ষাই মূল কথা। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। সেই মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। বহুরূপে প্রকৃতি প্রকাশিত। গাছ, পাথর, নদী, সূর্য, প্রাণী ইত্যাদিকে মানুষ পূজা করেছে। আবার প্রকৃতির নানা রূপকে প্রতীক হিসাবে মূর্ত্তি তৈরি করে মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজা করেছে। যেমন সরস্বতী মূর্ত্তি পূজা সরস্বতী নদীর প্রতীক। বিদ্যা, জ্ঞান এবং ধনেরও প্রতীক। যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবের তিনশ বছর পরেও বিশাল বাইজেনটাইন (রোম) সাম্রাজ্যে প্রকৃতি পূজা ও মুর্ত্তিপূজাই প্রচলিত ছিল।

ভারতে প্রকৃতি পূজার গবেষণা এমন উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার সঙ্গে মিল আছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে। আধুনিক কালে প্রকৃতির ভারসাম্য (ecological balance) রক্ষার প্রয়োজনীয়তা একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। প্রাচীন ভারত ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গাছ, পাথর, নদী, প্রাণী—সবকিছুর পূজার রীতি প্রচলন করে। তুলসি গাছ হিন্দু বাড়ির নিশানা। প্রকৃতি সব জায়গায় ও সবকিছুতে। হিন্দুর ঈশ্বরও তাই সব জায়গায় সবকিছুতে। বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ সব ধারায় অহিংসা এক সাধারণ নীতি। কিন্তু অহিংসা চরম নয় বেদে। বেদে ক্ষাত্র গুণের স্থান দ্বিতীয়। ধর্ম রক্ষা, দেশ রক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

প্রকৃতি পূজারিদের খৃষ্টানরা প্যাগান (যার একটি অর্থ অসভ্য 'rustic') এবং মুসলিমরা অংশীবাদী বলেন। আদিতে প্রকৃতি পূজাই ছিল বিশ্বব্যাপী। দেশে দেশে

তার রীতিনীতিতে পার্থক্য, বৈচিত্র এমনকি বৈপরিত্য থাকলেও প্রকৃতির পূজকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তারা অহিংস, অসামরিক, অরাজনীতিক, অসংগঠিত ও ঐক্যহীন। সুতরাং সংখ্যায় বিশাল হলেও শক্তিতে দুর্বল। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের প্রকৃতি পূজারীরা সেই প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষাত্রশক্তি ভারতে যথেষ্টই ছিল। তাই প্রকৃতি পূজারী হিন্দুরা আজও ভারতে আছে। অপরদিকে রিলিজন* ও ইসলাম একেশ্বরবাদী। সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত সমাজ, জন্ম দিয়েছে বহু সফল যোদ্ধা ও রাজনীতিকের। ইসলামে আছে জিহাদ। নামাজ পড়া সুশৃঙ্খল জমায়েত, চার্চে প্রার্থনা ও সমাবেশ (congrigational)। উভয়ে ধর্মান্তরকরণ করে দেশে দেশে প্রকৃতি ও মূর্ত্তি পূজারীদের ধর্ম ও জাতিসত্তা বিলোপ করেছে।

উন্নত রণকৌশলের গুণে প্রথম খৃষ্টান সম্রাট কন্স্টেনটাইন মূর্ত্তিপূজক সম্রাট লিসিনিয়াসকে পরাজিত ও হত্যা করে বিশাল বাইজেনটাইন (রোম) সাম্রাজ্য দখল করলেন, যদিও লিসিনিয়াসেরই ছিল ৩০,০০০ বেশী সৈন্য। তাদের সম্রাটের পরাজয়ে সাম্রাজ্যের মূর্ত্তিপূজারীরা নিরাপত্তাহীন হল। সম্রাট কন্স্টেনটাইন মন্দিরগুলি বন্ধ, ধ্বংস ও লুঠ করলেন, দরজা খুলে নিলেন, জমি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং যেখানেই দরকার চার্চ ও বিশাল হলঘর তৈরি করে দিলেন।** রাষ্ট্রশক্তিহীন প্রকৃতি পূজারীদের খৃষ্টান হতে হল। ইউরোপের মানুষ খৃষ্টান হয়ে গেল। মিশনারীদের মূল লক্ষ্য কন্‌র্ভারসন্ (খৃষ্টান করা)। গান্ধীজি লিখলেন, 'ধর্মান্তর এখন একটি ব্যবসা বিশেষ। আমি স্মরণ করি পত্রিকায় পড়া একটি রিপোর্ট যাতে বলা হয়েছে খৃষ্টানে ধর্মান্তর করতে মাথাপিছু কি পরিমান খরচ হয় সেই হিসাব অনুসারে কন্‌ভারসনের জন্য পরবর্তী বাজেট হবে' ('Conversion nowadays has become a matter of business. I remember having read a missionary report saying how much it cost per head to convert and then presenting a budget for the next harvest.'–*Young India,* 23 April 1931 quoted in K.L.S. Rao, 'Conversion : A Hindu/ Gandhian Perspective' : 146)। উল্লেখ্য, ২০১০ খৃ. খৃষ্টান সংগঠন ওয়ার্ল্ড ভিশন অফ ইন্ডিয়া ২১১.৬২ কোটি টাকা বিদেশী অর্থ পেয়েছে। এরকম আরও আছে ভারতে।

ইসলাম কঠোর একেশ্বরবাদী—আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই। ৬২৪ খৃ. বদর যুদ্ধের সময় থেকে মহম্মদ (স.) যুদ্ধ ও অনেক সংঘর্ষের পর মক্কা অধিকার

* ইংরাজী 'রিলিজন' শব্দের যথার্থ বাংলা পরিভাষা নাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিভা, ২/৭০৭

** A.H.M. Jones, *Constentine and the Conversion of Europe,* pp. 169–81

করেন। আরবে মূর্ত্তি ছিল। ৬৩০ খৃ. জানুয়ারিতে মক্কা বিজয় সম্পূর্ণ হলে মহম্মদ পবিত্র স্থানে ঢুকে বহু মূর্ত্তি ধ্বংস করেন, কথিত আছে যে তার সংখ্যা ৩৬০টি ['Entering its (Makka's) great sanctuary Muhammad smashed the many idols, said to have numbered three hundred and sixty'.– P. K. Hitti, p. 118; *বুখারী শরীফ*, ৩/৬৫৮]।

এন. জে. দাউদ লিখেছেন যে ৬৩০ খৃ. মহম্মদ (সঃ) মক্কা অধিকার করেন—'সমস্ত অধিবাসী ধর্মান্তরিত হল' (...'the entire population converted'. –*The Koran,* tr. N. J. Dawood, Penguin Classics, pp. 13–14)।

খালিফাদের নেতৃত্বে সিরিয়া, ইরাক, ইজিপ্ট, বারাক, পারস্য একের পর এক আক্রমন ও দখল হয়। রাষ্ট্র দখলের ফলে দেশের অধিবাসীরা নিরাপত্তাহীন হয়। অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যারা মুসলমান হয় না তাদের থেকে টাকা (জিজিয়া কর) আদায় করা হয়। দু-চারশ বছরের মধ্যে ঐসব দেশের প্রায় সমস্ত অধিবাসী মুসলিম হয়ে যায়। যদিও ৬৩৬-৩৭ খৃ. প্রথম মুম্বাইতে আরব অভিযান, তারপরের ৭৬ বছরে কিছু ব্যর্থ অভিযানের পর ৭১২ খৃ. মঃ কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু দখল সম্ভব হয় কিছু 'বিশ্বাসঘাতকতায়', বীরত্বের অভাবে নয়। যুদ্ধে ব্রাহ্মণ রাজা দাহির ও তাঁর ১৬ হাজার (মতান্তরে ২৬ হাজার) সৈন্যকে মঃ কাসিম হত্যা করেন। তিনি সিন্ধুর অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। যারা বাধ্য হয় না তাদের দিতে হয় (১) অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ কর ও (২) মাথাপিছু ধার্য কর। কিছু মন্দিরের জায়গায় মসজিদ তৈরি হয় (*Chach-Nama*, tr. Elliot & Dowson, pp. 158, 176, 181, 203-5; বঙ্গানুবাদ, আরতি সেন, পৃ. ১৮, ২৪, ৩৪, ৩৮, ৫৯)।

৯৯২—১০৩০ খৃ. মধ্যে আল্-পিটজিন, সবুক্তিগিন ও সুলতান মামুদ কর্তৃক প্রাচীন ভারতের আফগানিস্তানে রাজত্ব ও সেখানে ধর্মান্তরকরণ হয়। ভারতের বিপুল ধন সম্পদ লুঠ, দু লক্ষ* ভারতবাসীকে বন্দী হিসাবে (বিক্রি করতে) ধরে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতের অমূল্য সভ্যতা ধ্বংস করেন ১৭ বার ভারত অভিযান করে সুলতান মামুদ। ৫০ হাজার হিন্দু সোমনাথ মন্দির রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ দেন। যদিও সংখ্যালঘু, ১১৯২ খৃ. থেকে দিল্লি ও ১২০৪ খৃ. থেকে বাংলা অধিকার করেন মুসমলনরা এবং মুসলিম শাসন চলেছে দীর্ঘ ৫৬৫ বছর। ১৭৫৭ থেকে সংখ্যালঘু ইংরেজের শাসন চলেছে ১৯৪৭ পর্যন্ত। ভারতে সংখ্যালঘু শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু দুর্বল সেই প্রমাণই ইতিহাস দেয়। মধ্য

---

* পন্ডিত নেহেরু, *Glimpses of W. History,* p. 115

যুগের হিন্দুরা ইতিহাস প্রায় লেখেন নি। মুসলিমদের লেখায় ধর্মান্তরকরণের ইতিহাস প্রায় নেই। ইতিহাস হিন্দুর মগজ ধোলাই করে। ধর্মান্তরকরণ দ্বারা সংখ্যাগুরু ভারতবাসী পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, বালুচিস্তান ও উ. প. সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় এবং মুসলিমরা হন সংখ্যাগুরু। মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবী করে। সি পি আই পাকিস্তান দাবীকে ন্যায্য ঘোষণা করে লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের যোগ দিল ('The Communist Party is the only party that recognizes the muslim demand for Pakistan as just and calls the Muslim League to achieve the fundamental goal of Pakistan through the united struggle of the League, Congress and Communists.'–Bhowani Sen, Sec. CPI, Bengal, *Natun Bangla,* 1946, p. 69)। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হলে প্রায় সকল কমিউনিস্টরা ভারতে এলো এবং পাকিস্তানী দৃষ্টিভংগীতে ইতিহাস তৈরি চলল—যেমন তিতুমীরের ওয়াহাবি মৌলভি আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন রূপে প্রচার, মন্দিরের উপরে তৈরি বাবরি মসজিদের সমর্থন, ধর্মান্তরকরণের কারণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অত্যাচার, সরস্বতী আফগানিস্তানের নদী এবং যে যে বিষয়ে গবেষণায় তাঁরা বিরত—ভারতে এবং বিশ্বব্যাপী খৃষ্টানে ও ইসলামে ধর্মান্তরকরণ, ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংসের ইতিহাস, ভারতীয় সভ্যতার গৌরব, ধর্মনিরপেক্ষ পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ মানল, কিন্তু সংখ্যালঘু বিনিময় মানল না। পারসিক, গ্রীক, কুষাণ, হুন প্রভৃতি আক্রমণকারিরা এসে অনেকে ভারতে থেকেছে, বিদেশী নাম-ধাম-ধর্ম ভুলে তাঁরা ভারতীয় হয়ে গেছেন। কারণ তারা ধর্মান্তরকরণ করতনা ভারতবাসীদের। ধর্মান্তরকরণদ্বারাই ঘরের লোক পর হল। পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, উ. প. সীমান্ত প্রদেশের জমিতে ভারতবাসীর আর অধিকার থাকল না ১৯৪৭ সাল থেকে। বিনিময়ে কি পেল? ১৯৫৫ সালে নেহেরু সরকার হিন্দু বিবাহ আইন বলবৎ করল যা বেদ বিরোধী। হিন্দু হলে এক স্ত্রী, দুই স্ত্রী হলে আইন ভঙ্গের শাস্তি ৩ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত জেল*, মুসলমান হলে চার স্ত্রী বৈধ, এমনকি পঞ্চম বিবাহ করলেও সে বিবাহ বাতিল নয়, প্রণালীবদ্ধ নয় এমনই বিবেচিত হবে।** হিন্দু পুরুষের যৌন অধিকার কি সুরক্ষিত?

**Indian Penal Code Commentary* by S. C. Sarkar pp. 244–45 : "In view of the allegation regarding second marriage an offence under section 494 of the Indian Penal Code also disclosed which is punishable by imprisonment

মুসলিম বিয়ে বয়ঃসন্ধিতে—১৫ বছরের পর। পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কের বয়ঃসন্ধির পূর্বে বিয়ে অভিভাবকের দ্বারা চুক্তি বলে বৈধ। জুডিশিয়াল কমিটির মতে মুসলিম বালিকার ৯ ও বালকের ১২ বছর বিয়ের বয়স।*** আইন বলবৎ করে হিন্দু নারীর বিয়ের বয়স ১৮ পুরুষের ২১ বছর। হিন্দুর এক স্ত্রী, বয়ঃসন্ধিতে বিয়ে বেআইনী, বেশী বয়সে বিয়ে, অভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা আইন নাই। এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করার ফলে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস চলছে—কয়েকশ বছরের মধ্যে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার এবং এই প্রাচীন সভ্যতা বিলোপের সম্ভাবনা দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনসংখ্যা শতাংশে (%)****

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৭৮.৪	৭৮.৮	৭৮.১	৭৬.৯৬	৭৪.৭২	৭২.৪৭
মুসলমান	১৯.৮	২০.০	২০.৫	২১.৫১	২৩.৬১	২৫.২৫

পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাব্য হিন্দু জনসংখ্যা

২০১১	২০২১	২০৫১	২০৫৩
৬৯.২৮	৬৫.৬৬	৫১.৪৪	৪৯.৭৪

ভারতে ২০০১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২০ শতাংশ, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২৯.৩ শতাংশ (*মনোরমা ই. বুক* ২০০৯ঃ২৯৫)।

for a term which may extend to seven years".

** *Principles of Mahomedan Law* by M. Hidayatullah & A. Hidayatulla, p. 285 : '255 Number of Wives–A Mahomedan may have as many as four wives at the same time but not more. If he marries a fifth wife when he has already four, the marriage is not void but merely irregular."

***p 282 '251. **Capacity for marriage.**–(1) Every Mahomedan of sound mind, who has attained puberty, may enter into a contract of marriage.

(2) Lunatics and minors who have not attained puberty may be validly contracted in marriage by their respective guardians [ss. 270–275].

Explanation.–Puberty is *presumed,* in the absence of evidence, on completion of the age of fifteen years'.

With reference to a girl the Judicial Committee observed that the age of puberty in Mahomedan law is nine years. (d). Their Lordships were no doubt referring to the passage in the Hedaya that "the earliest period of puberty with respect to a boy is twelve years and with respect to a girl nine years" (p. 283).

**** মোহিত রায়, *অনুপ্রবেশ, অস্বীকৃত উদ্বাস্তু ও পশ্চিম বঙ্গের অনিশ্চিত অস্তিত্ব,* ক্যাম্ব, কলকাতা, পৃ. ৩২; মনোরমা ই. বুকঃ ২০০৯, পৃ. ২৯৫ তে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান জনসংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধির অনুপাত আছে ভারতের।

ভারতের আদি ধর্ম অরাজনীতিক। তাই হাজার বছর প্রকৃতি পূজারী হিন্দুরা ভারতে আছে কিন্তু তাদের রাষ্ট্র নাই। অতীতে তারা ধর্মান্তর করতো না, ধর্মান্তরিত হতো। ধর্মান্তরকরণ দ্বারা খৃষ্টানরাষ্ট্র কমপক্ষে ১১৬টি, মুসলিম রাষ্ট্র ৪৭টি, বৌদ্ধ ও ইহুদি রাষ্ট্রও আছে পৃথিবীতে। প্রাচীন ভারতবাসীর জমিতে হয়েছে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র—আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং তারপরে বাংলাদেশ। রাষ্ট্র না থাকলে উদ্বাস্তু হতে হয়।

প্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতির একটি জাতি ইরাণী। তাঁদের ধর্ম ও অতীতে রাষ্ট্রধর্ম ছিল জরোথুষ্টিয়। এই প্রাচীন জাতির ধর্মসংস্কৃতি ছিল এক বিশেষ জীবনধারা—যার ছিল নির্দিষ্ট একটি ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, কবিতা, উৎসব, খাদ্য ও রঙ্গরসিকতা। হাজার বছর ধরে তাঁরা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষা করে চলছিলেন। নবম শতাব্দীতে আরব আক্রমণ ও মুসলিম অত্যাচারে ('Following Muslim oppression in Iran') তারা ছন্নছাড়া হন—না থাকে নিজেদের বাসভূমি না রাষ্ট্র। একদল ভারতে আসেন, হিন্দু রাজা যাদব রানা আশ্রয় দেন। তারাও বন্ধু হলেন। বর্তমান পার্সিদের তারাই পূর্বপুরুষ। আর এক দল চীনে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে হয়েছে ('totally wiped out') সম্ভবত (চীনাদের সঙ্গে) পারস্পরিক বিবাহ প্রক্রিয়ার দ্বারা। একথা আমরা জানি ঐতিহাসিকদের থেকে এবং সেখানে পরিত্যক্ত অগ্নিপূজার বেদীগুলি থেকে' (H. B. Dhalla, 'Contra Conversion' : The case of Zoroastrian in India, pp. 121, 132-3)। নিজেদের রাষ্ট্র না থাকলে সভ্যতা, ধর্ম-সংস্কৃতি এমন কি জাতিসত্তাও বিলোপ হয়। ইরাণের প্রাচীন ধর্ম-সভ্যতা নাই। তারপরে আফগানিস্তানে নাই। পাকিস্তানেও নাই। কাশ্মীরের জমি কেনার অধিকার ভারতবাসীর নাই। আমরা পুর্বপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞ। সম্ভবত তাঁদের জন্য ভারত ইরাণ হয়ে যায়নি।

ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ না হলে নির্দিষ্ট বাসভূমি থাকবে না। ধর্ম ও জাতি সত্তা থাকবে না। উদ্বাস্তু হতে হবে। ধর্ম, সভ্যতা ও জাতি সত্তা ধ্বংস হবে। যেমন হয়েছে জরোথুষ্টিয়দের, প্যাগানদের এবং যা হতে চলছে তিব্বতীদের। ঋগ্বেদের শেষ নির্দেশ 'তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও' (ঋগ্বেদ/১৯১/১/৪)।

এক দেশে এক আইন এবং অভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা আইন হোক। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ ধারা অনুসৃত হোক।
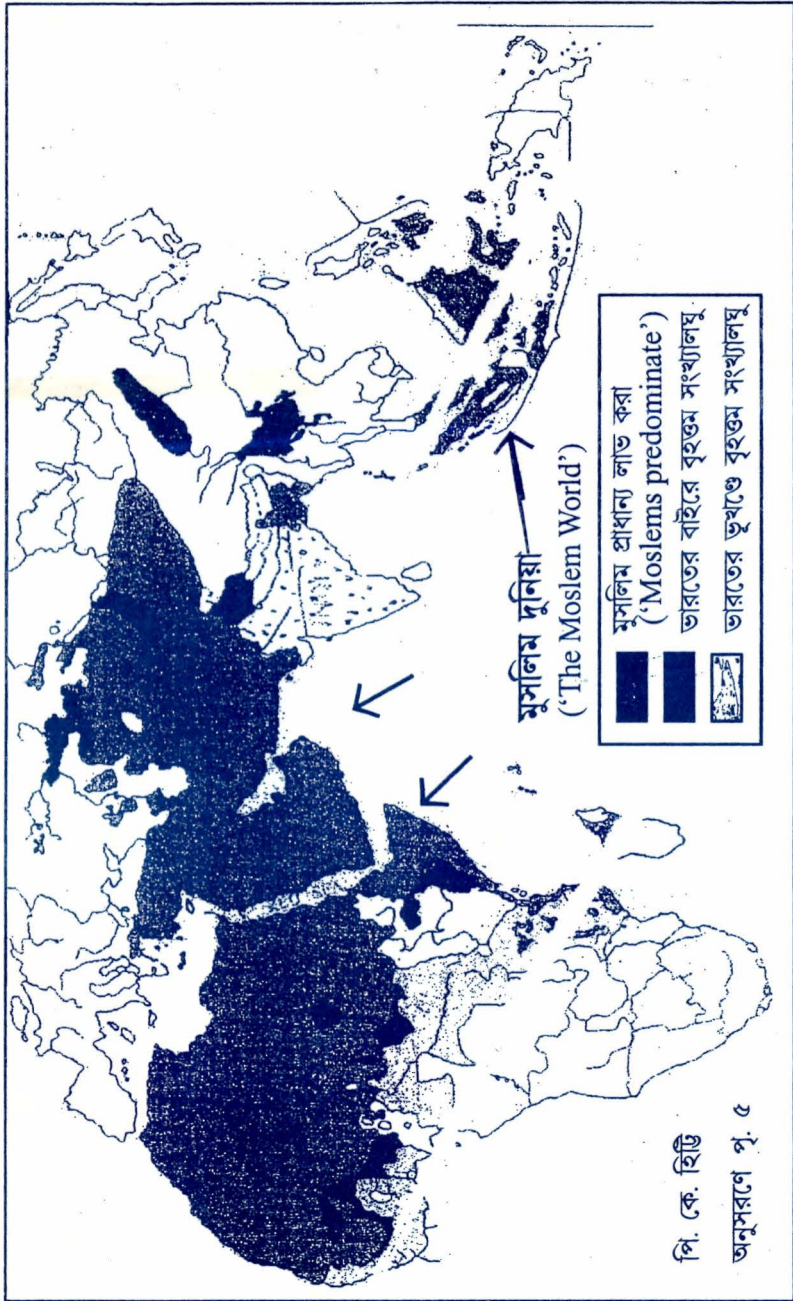
মুসলিম দুনিয়া
('The Moslem World')
মুসলিম প্রাধান্য লাভ করা
('Moslems predominate')
ভারতের বাইরে বৃহত্তম সংখ্যালঘু
ভারতের ভূখণ্ডে বৃহত্তম সংখ্যালঘু
পি. কে. হিট্টি
অনুসরণে পৃ. ৫

bibliography

Agarwal, D P, *Archaeology of India.*

Allchin, B and R, *The Birth of Indian Civilization*

——————, *Origins of a Civilization.*

Chakraborti, D K, *The Oxford Companion to Indian Archaeology*

Encyclopedia of Asian History

Encyclopedia of Ancient World

Encyclopedia of Hinduism

Dhabalikar, M K, *Indian Protohistory*

Griffith, T H, Ralph (tr.), *The Hymns of the Regveda*

Gupta, S P, *The Indus Sarasvati Civilization*

——————, 'The Lost Sarasvati and Indus Civilization'

Jarrige, Jean Francosis, 'Origin of Harappan Civilization and Mehrgrah Excavations' in D.P. Sharma

Lal, B B, *The Earliest Civilization of South Asia*

Jones, A.H.M., *Constantine and the Conversion of Europe*

————, Archaeology of Sarasvati' in D P, Sharma and M. Sharma (ed.) Early Harappans and Indus Sarasvati Civilization

Marshall, J(ed.), *Mohenjo-daro And the Indus Civilization,* vol. 1–3

Mughal, M R, 'Recent Archaelogical Research in the Cholistan Desert in S P Gupta (ed.), *The Lost Sarasvati*

Possehl, G L, 'Transformation of Harappan Civilization'

Rajaram, N S, 'Sarasvati : River and Civilization'

UNESCO, *History of Huminity,* v. 1–3

চাচ-নামা—অনুবাদক, আরতি সেন

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (বি.ভা.), ১২

রায়, মোহিত, 'সংখ্যালঘু ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ,' *দেশকাল ভাবনা* (কলকাতা), ২/৫ সংখ্যা

দত্ত রমেশচন্দ্র (অনুবাদিত), *ঋগ্বেদ সংহিতা*

ব্যানার্জী, রাখাল দাস, *বাংলার ইতিহাস*